

কলোরাডো নদীর তীরে



কাজল ভূইয়া

কোনো ভ্রমণের দুটো দিক, একটি ভৌত চোখে দেখা, অপরটি দেখা হল মনের গভীরে। দুটো যখন মিলে যায় তখনই তা অপরূপ সৃষ্টি হয়ে উঠে। একারণে সকল ভ্রমণকথাই যে সৃষ্টিরূপ পায় তা নয়, কোনো কোনোটি পায়। যেগুলো সৃষ্টিরূপ পায় পাঠকের অন্তরের গভীরে তা বেঁচে থাকে, সেসবের মধ্য দিয়ে লেখক যেমন পাঠকের অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করেন তেমনি পাঠকও সেসকল স্থান, সেখানকার মানুষ নিসর্গ সব কিছুই নিজের অন্তরে নতুনভাবে সৃষ্টি করে নেয়। সব দেখা এক রকমের নয় সকল ভ্রমণকথা ও এক রকমের নয়। যিনি দেখেন তিনি কখনো নিষ্পত্তি নির্লিপ্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন আবার কখনো নতুন জনপদ ও মানুষ তার মনে একাকার হয়ে মিশে যায়। কেবল দুচোখে দেখে যাওয়া এবং মনের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া এ দুটো এক নয়। প্রচলিত ভ্রমণকথার বাইরে এগুলো মনের গভীরে নিবিড় সংলাপের মত, অনেকটা নিজের সঙ্গেও এ সংলাপ, সেকারণে এরূপ ভ্রমণকথা সৃষ্টিরূপে সমৃদ্ধ, পাঠককেও তা নতুনভাবে সৃষ্টি করে তোলে। কাজল ভূইয়া আমেরিকা ভ্রমণ করে এসেছেন। আমেরিকায় তাঁর বড়ো ছেলে কলক এবং বড়ো মেয়ে কান্তা থাকে, সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁর ত্তীয় প্রজন্ম শিশু নাতনী পারিসা থাকে। আমেরিকায় গিয়ে তাদের কাছে পাবার আনন্দ সব কিছু প্লাবিত করে দিয়েছে, একটি ভালোলাগার আনন্দের মধ্যে তিনি আশে পাশের সব কিছুকে পেয়েছেন। তাঁর অন্তর উন্নত ছিল, বৰদেশে প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে নতুন একটি দেশ নতুন একটি পৃথিবী নিসর্গ মানুষ সমাজ জীবন তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে এবং নিঃসঙ্গে ধরা দিয়েছে। প্রিয়জনদের জন্য মমতা ভালোবাসা সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে। এভাবে তাঁর আমেরিকা দেখা নিবিড় আন্তরিক, সেখানকার নিসর্গ ও মানুষ প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলে মিশে তাঁর অন্তরে গভীর স্থান করে নেয়। ছেলের কর্মসূলের স্থাপনাগুলো, মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা পরিমণ্ডল ও স্থাপনাগুলো তাঁর একান্ত নিজের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাতনী পারিসা ছিল আমেরিকা খুজে পাবার মিডিয়া। এজন্য লেখকের ভ্রমণকথার প্রকাশ অত্যন্ত আন্তরিক, নিজেকেও তিনি অপ্রকাশিত রাখেননি। আবার সেকারণে তাঁর দেখার ভুল কোথাও হয়েছে তা নয়, বস্তুনিষ্ঠতা যেখানে প্রয়োজন সেখানেও কোনো ভুল নেই। আমেরিকায় আসা যাওয়ার পথের পরে নতুন করে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে লেখকের অন্তরঙ্গ আমেরিকা, এ বইয়ের মধ্য দিয়ে যে আমেরিকা একত্রে পাঠকেরও। কলোরাডো নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যমুনা নদী, তিনি আঁকড়ে ধরেছেন তেজস্বিনী স্নোতার্সিনী কলহাস্তরিতা যমুনা নদীকেই। কলোরাডো নদীও তাকে বন্ধিত করেনি, নাতনী পারিসার স্বপ্নের পৃথিবী তো এখন এর ভীরে এবং একে ধিরেই। আমেরিকা দেখার এরূপ অনেক কথা নিয়ে লেখকের নিজের মনের রঙে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে কলোরাডো নদীর ভীরে।

কলোরাডো নদীর শীরে

কাজল ভুঁইয়া

শাওন প্রকাশনী

প্রকাশনায়।
শাওন ইয়াসমিন
শাওন প্রকাশনী
বাড়ি ৩, রোড ৫
রুক এ, সেকশন ১১
মিরপুর, ঢাকা
বাংলাদেশ
E-mail: mmahmud@bangla.net

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ.
୨୦୦୮

© লেখক

ପ୍ରଚ୍ଛଦ,
ମସିଉଜ୍ଜାମାନ ମାହୟୁଦ
କଲୋରାଡୋ ନଦୀର ତୀରେ
ମୁହିଉଜ୍ଜାମାନ ମାହୟୁଦେର ତୋଳା
ଲେଖକେରୁ ଛାବି ଅବଲମ୍ବନେ

ISBN 984-32-0933-8

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
প্রোব প্রিন্টার্স লিমিটেড
১৯ শেখ সাহেব বাজার
আজিমপুর, ঢাকা

मूल्य : दुई शत टाका

Colorado Nodir Teerey (On the bank of the river Colorado) by Kazal Bhuiyan, Published in 2004, by Shaon Prakashoni, House 3, Road 5, Block A, Section 11, Mirpur, Dhaka, Bangladesh. Price: Taka Two hundred only, US \$ 10.

পারিসা

আমেরিকায় প্রবাসকালে
আমার শৃতিময় শৈশবে
তোমার সঙ্গেই হল

প্রসঙ্গ কথা

সব মানুষই স্বপ্ন দেখে, সব স্বপ্ন সফল হয় না। কখনো কখনো কিছু স্বপ্ন সফল হয়, আবার কখনো স্বপ্নপূরণের একেবারে নিকটে যেয়ে তা হয়ত ভেঙ্গেও যায়। কোনো স্বপ্ন সফল হলে নতুন করে বেঁচে থাকার আনন্দ সৃষ্টি হয়ে ওঠে। ছোটোবেলায় বাবাকে দেখেছি লেখালেখি করতে। বাবাকে দেখে খুবই ইচ্ছা হত আমি যদি বাবার মত লিখতে পারতাম তাহলে মনের কথা সব বলতে পারতাম। ইচ্ছাটা মনে মনে থেকেই গিয়েছিল। বিয়ের পর স্বামীকে লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি, তিনি প্রতিষ্ঠিত লেখক। নিকট আঘাতের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত লেখক অনেকে আছেন। বিভিন্ন সভা সমিতিতে যেয়ে অনেক বড়ো লেখককে নিকটে থেকে দেখেছি, কারো কারো সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয়েছে। আমার স্বামীর সূত্রে অনেকের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিলই। আমার লেখালেখির আগ্রহ কখনো পেছনে চলে যায়নি। এখন ছেলেমেয়েদের সূত্রে বিদেশ দেখার সুযোগ হল, একত্রে লেখার সুযোগও হল। তারা আমাকে লেখার জন্য খাতা কলম এগিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করে দিয়েছে, লেখা শেষ করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। লেখা শেষ করার পর বিশয়ের সঙ্গেই মনে হল আমি হয়ত আগেও আরো লিখতে পারতাম। লিখেছিলাম, তবে সেগুলো ছিল কলেজ ম্যাগাজিন ও ছোটোখাটো পত্রিকা পর্যন্তই। সে সময় সেভাবে আঘাতিশাস ছিল না বলে এর বেশি এগোতে পারিনি। কলোরাডো নদীর তীরে লেখার পর মনে হচ্ছে, কলেজ ম্যাগাজিন ও ছেটো পত্রিকা ছাড়িয়ে বড়ো পরিসরে এসেছি।

আমেরিকায় এসে মনে হল পৃথিবীটা এখানে নতুন, আগে কখনো দেখিনি বলেই আমার কাছে সব কিছু নতুন বলে মনে হল। এখানে প্রকৃতি আমার কাছে নতুন, পরিবেশ নতুন, মানুষ নতুন, আগে কখনো দেখিনি বলেও এখানে এসে আমার কিছু বলার আগ্রহ সৃষ্টি হল। ভ্রমণ কাহিনী অনেক পড়েছি, সেগুলো অন্যের চোখে পৃথিবী দেখা। এখানে এ দেখা আমার নিজের, যেগুলো আমার মনের গভীরে প্রবেশ করে আর মুছে যায়নি কলোরাডো নদীর তীরে সেগুলো নিয়েই লেখা। কেমন হল তা বিচারের ভার পাঠকের, এ বই যারা পাঠ করবেন তাদের।

বাংলা ভাষায় কাউকে সংবোধনের মধ্যে নানান রকমের বিভিন্নিবোধ আছে, ইংরেজিতে সেভাবে নেই। বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে গেলে বাংলা ভাষা এবং আমাদের সমাজ জীবন আর সামনে আসে না। এটা অনুসরণ করে আমি প্রায়ই দেশ বিদেশী সকলের ক্ষেত্রে সংবোধনে তুমি ব্যবহার করেছি।

এখানে পাঠকের কাছে এলাম আমার মনের কথাগুলো নিয়ে। তাদের যদি সঠিকভাবে এগুলো জানাতে পেরে থাকি সেখানে আমার সার্থকতা।

আমি কৃতজ্ঞ অনেকের কাছেই।

কাজল ভূইয়া

বৈশাখ

১৪১১

ঢাকা

আমার এই পথগুলি বসন্তের জীবনে কোনোদিন দেশের বাইরে যাইনি শুনে ভিসা অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, not even in India? উত্তরে আমি হেসে বললাম, না ইভিয়াতেও যাওয়া হয়নি। আবার প্রশ্ন, Why? দেখ, আমি পুরোপুরি হাউস ওয়াইফ, সংস্থাৰ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি, তাই দেশের বাইরে যাবার মত সময় করতে পারিনি। পুনরায় প্রশ্ন, তোমার হাসব্যাড বিদেশে যায়নি কখনো? বললাম আমি, হ্যাঁ, অফিসের কাজের প্রয়োজনে কয়েকবার গেছে।

আমার বড়ো ছেলে কনক আমেরিকায় থাকে, ওর বাসায় বেড়াতে যাব তাই আমেরিকান দুতাবাসে ভিসার জন্য ইন্টারভিউ। ভিসা অফিসার হয়ত আমাকে আরো প্রশ্ন করত তার আগেই আমি তাকে বললাম, দেখ, আমার নাতনীকে দেখার জন্য আমি আমেরিকা যেতে চাইছি। ভিসা অফিসার এবার হেসে বলল ও কে আমি তোমাকে ভিসা দিছি এন্ড হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বের হয়ে এলাম। আমার যে ভিসা হয়ে গেছে তা বোধ হয় আমার চেহারা দেখেই বোৰা যাচ্ছিল। তাই আর যারা ইন্টারভিউয়ের জন্য তখনে অপেক্ষা করছিল তাদের কাউকে কাউকে বলতে শুনলাম উনার ভিসা হয়ে গেছে। বুকের ভিতর এক নতুন ধরনের অনুভূতি। হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরতে পারছিলাম না, হাত কাঁপছিল। ব্যাগসহ সব কাগজপত্র দুহাতে জাপটে ধরে বাইরে অপেক্ষারত আমার স্বামীর কাছে ঢেলে এলাম। আমার স্বামী ড. বিডিউজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি. করেছে, বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে ঢাকুরি করেছে, এখন অবসর জীবন যাপন করছে। লেখক ও গবেষক হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিষ্ঠা আছে, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি বিষয়ে তার অনেকগুলো তালো গ্রন্থও বেরিয়েছে। তাকে আবেগমিশ্রিত গলায় বললাম, আমার ভিসা হয়ে গেছে। তার বোধ হয় ধারণা ছিল আমার ভিসা হয়ে যাবে, তার মানসিক প্রস্তুতিও বোধ হয় ছিল। আমাদের নাতনী পারিসার সঙ্গে শীত্রই দেখা হতে পারে সেজন্য আমাকে অভিনন্দন জানাল।

আমার শুরু হল নতুন একটি সুপ্রভাতের জন্য অপেক্ষার। এখন নতুন নিয়ম করেছে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর যে শাখায় টাকা জমা দেয়া হবে তিসি হবার পর সেই শাখা থেকেই পাসপোর্ট আনতে হবে। আমি আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর মতিবিল শাখায় আমার পাসপোর্টসহ তিসি ফরম আর টাকা জমা দিয়েছিলাম, সেখান থেকেই পাসপোর্ট আনতে হল। যেদিন ইন্টারভিউ দিয়েছি তার পরের দিন শুরুবার, ছত্রিত দিন

সেজন্য দুই দিন পর পাসপোর্ট আনতে গেলাম। ব্যাথকের কর্মকর্তা আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বেশ হাসি দিয়ে বলল, আমাকে পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা দেয়া হয়েছে। আমার ভিসা পাওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে আমার আগ্রহ ও উৎকর্ষ অনেক ছিল। কিন্তু ভিসা হবার সংবাদ শুনে তাও আবার পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা হয়েছে শুনে সেই মুহূর্তে আমার আনন্দের শিরৱণ প্রকাশ করার ভাষ্য নেই। আমি আমার নাতনী পারিসার কাছে যাচ্ছি, বড়ো দুই ছেলে মেয়ের কাছেও যেতে পারছি, এ আনন্দের তুলনা নেই।

উনিশশো চৌষট্টি সালে তখন আমি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আমার মা করোনারি থ্রুহোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হল। আমরা ছয় বোন দুই ভাই, তৃতীয় ছিল যে বোন নাম ছিল রাণী অত্যন্ত শৈশবেই পৃথিবীর মাঝে ছেড়ে চলে গেছে সবচেয়ে বড়ো যে ভাই, আবদুল কাদের ভূইয়া ডাক নাম ঠাঁশু, প্রায় বছরখনেক দুরারোগ্য ক্যাপারে আক্রান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে গেছে। মার জন্য এটা সহজ ব্যাপার ছিল না, এসকল শোক দুঃখ বেদনা বুকে চেপে রাখতে রাখতে আমার চোদ বছর বয়সে মা এই কঠিন অসুখে পড়ল। এখন আমার বড়ো দুই বোন এক ভাই ছোটো দুই বোন। বড়ো দুই বোনের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, তারা স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমার বড়ো একমাত্র ভাই, সেও স্কুলে পড়ে, ছোটো দুই বোনও প্রাইমেরী স্কুলে পড়ে। আমার বয়স তখন চোদ, অবিবাহিত তিনি বোনের মধ্যে আমি যেহেতু বড়ো ছিলাম সুতৰাং বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক নিয়মেই সংসারের সকল দায়িত্ব আমার নিকট এল, বাস্তব ট্রেনিং যাকে বলে তা আমি পেলাম এখান থেকেই। বাবা আবদুল কুদুম ভূইয়া শিক্ষা বিভাগে মধ্য পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। এক সময় ফৌজদারাহাট ক্যাডেট কলেজের বার্সার, তৎকালীন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক ইত্যাদিও ছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে উচ্চ শিক্ষা এহণ করেও এসেছিলেন, তাঁর রচিত বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তকও আছে। সেকালকার হিসাবে আমাদের পরিবারে মডারেট আর্থিক সঙ্গতি ছিল, কাজের লোকের অভাবও ছিল না। আসল কাজটা ছিল সংসারের দায়িত্ব নেয়া, সে দায়িত্ব আমাকেই নিতে হল। মার সেবা যত্ন থেকে শুরু করে ছোটো বোনদের দেখাশোনা করা ঘরে সংসারের হিসেব নিকেশ রাখা এগুলো সবই আমার কাছে। এগুলোর সঙ্গে সামাজিকতার অংশও ছেটো ছিল না। বাবা মা দুজনেই অমায়িক ধরনের, তাদের বুরুন্দি সবাই আমাদের আঞ্চায়তুল্য, এছাড়া নিকটের ও দূরের আঞ্চায় অনেক। আসলে দূরের আঞ্চায় বলে কিছু নেই, বাবা মার কারণে সকল দূর একেবারে নিকটে চলে এসেছে, আমরা পার্থক্য করতে পারিনি। মার অসুস্থতার পরে এগুলো আমার দায়িত্বের অংশ হল, এসবের সঙ্গে আবার নিজের লেখাপড়াও চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

এভাবেই অভ্যন্ত হয়ে উঠছিলাম। এখানে ঠিক ছেদ পড়ল বলব না, বরং নতুন কিছু দায়িত্ব সংযোজন হল আমার বিয়ের পর। তখন ১৯৭০ সাল, আমি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার স্বামী তখন বাংলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগের পরিচালক। বিয়ের পর বাবা মার সংস্কার ছেড়ে নিজের সংস্কারে চলে এলাম। এখানেও থায় একই অবস্থা। আমার শৃঙ্খল শাশুটী কেউ বেঁচে নেই, আমার স্বামীর আপন ভাই বোনও কেউ নেই। ব্যস, বিয়ের পরদিন থেকেই নিজের সংস্কারের সব দায়িত্ব কাঁধে উঠে এল। দিন দিন দায়িত্ব বেড়েই চলেছে, দায়িত্ব পালনে পেছনে সরে যাবার

সুযোগ নেই। যে বছর আমি গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে এম.এস.সি পাশ করে আমার নিয়মিত একাডেমিক লেখাপড়া শেষ করলাম সেই বছরই আমার বড়ো ছেলে কনককে স্কুলে ভর্তি করা হল, নার্সারিতে। সংসারের প্রয়োজনেই আর পূর্ণকাল চাকুরিতে যোগ দিলাম না। আমার চার ছেলে মেয়ে। বড়ো হল ছেলে কনক, তারপর মেয়ে কাস্তা, এরপর ছেলে শোভন, সবার ছেটো মেয়ে শাওন।

সন্তুর সালে বিয়ে হল আমার। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হল। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন কনকের বয়স মাত্র দুই মাস, বাবার বাসা ৩১ চামোলীবাগে ছিলাম। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের একেবারে পাশে পঁচিশ মার্চ রাত থেকে মনে হয়নি যে বেঁচে যাব। কারফিউ শিখিল হলে সোজা যেয়ে সপরিবারে আশ্রয় নিলাম ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় তৎকালীন ৬ নম্বর রোডে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মায়ের বাড়িতে, তিনিই আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্মৃতির একটি বড়ো অংশ কনককে নিয়ে, আমেরিকায় যাচ্ছি কনকের মেয়ে আমার নাতনী পারিসার আমন্ত্রণে, সুতৰাং কনকের কথায় একটু দেল খাচ্ছি। দুরুক্তি কথা না বলে পারছি না। জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক ছিল বড়ো বোন ছেটো ভাইয়ের মত, সেই সূত্রে সম্পর্ক তার পরিবার ও আঘাতী স্বজনের সঙ্গেও। কনক জন্মগ্রহণ করার পর জাহানারা ইমাম কনককে একটি সোনার চেইন ফিফট দিয়েছিলেন, এখন এ চেইনটি কনকের মেয়ে পারিসা গলায় পরে। এ বাসায় বাবা মা ভাই বোন আমার বড়ো বোনের পরিবার এবং আমার খালাতো বোন সাবেরা মুস্তাফার পরিবার একত্রে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার খালাতো বোনজামাই কে. জি. মুস্তাফা খ্যাতনামা সাংবাদিক, পরবর্তীকালে লেবাননে এবং ইরাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। জাহানারা ইমাম তাঁর একাত্তরের দিনগুলি গ্রন্থে এসবের কথা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পরে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে কৃত যে পরিবর্তন হয়ে গেল। কোথাকার পানি কোথায় যে গড়িয়ে গেল তার খৌজ সেভাবে রাখিনি। এক মনে সংস্কর করে গেছি, ছেলে মেয়েদের গড়ে তোলার ব্যাপারেই পুরো মনোযোগ রেখেছি। মনে হয় একটি ঝাঁকি দিয়ে মৌনতা ভাঙল যখন আটলাস্টিকের ওপার হতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় নাতনী পারিসা ডাক দিয়ে বলল, দাদু আমেরিকা আসো। চমকে উঠলাম, তাইতো অনেক সময় পার হয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। চুলের সাদা রঙ আড়াল করার জন্য মেহেন্তি লাগাতে হয়। ছেলে মেয়েরা সব বড়ো হয়ে গেছে। এত বড়ো হয়ে গেছে যে আমার দুই হাত দিয়ে আগলে রাখা সংস্কার থেকে বেরিয়ে এর মধ্যে দুজন নিজেদের সংসারে চুক্ষেছে। আমার বড়ো ছেলে মুহিউজ্জামান মাহমুদ ডাক নাম কনক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী, বুয়েট থেকে ১৯৯৬ সলে অনার্সসহ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কনক আমেরিকা আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। টেক্সাসের লাবাকে অবস্থিত টেক্সাস টেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে এম.এস. করেছে। অল্প কিছুকাল ক্যালিফোর্নিয়ায় সিলিকন ভ্যালিতে একটি কোম্পানিতে চাকুরি করেছে। এখন টেক্সাসের অস্টিনে মেট্রোলা কোম্পানীতে প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরিত। আমার পুরুবপুরু নাহিন কবির বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গাজুয়েশন করে কনকের সঙ্গেই আমেরিকায় যায়। নাহিন এখন অস্টিনে সাউথ ওয়েস্ট টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সাইসে এম.এস. করছে। ১৯৯৯ সালে ১৯ জুন ওদের মেয়ে, আমার নাতনী পারিসার জন্ম হয়। কনক এখন ওর

কর্মস্থল অস্টিনে থাকে, অস্টিন হল টেক্সাসের রাজধানী। পারিসার বয়স এখন চার বছর। পারিসার বয়স যখন দেড় বছর তখন নাহিন ওকে সাথে নিয়ে দেশ থেকে বেড়িয়ে গেছে। পারিসা সে সময় বাবা আর মা এই দুটো শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারত না। কিন্তু এখন সে প্রচুর কথা বলতে পারে। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে মনে যা আসে তাই বলে।

চাকুরিতে যোগদান করার পর থেকেই কনক ওর আবাবা আর আমাকে অনেকবার বলেছে ওর কাছে বেড়াতে যাবার জন্য, কিন্তু সেই সংসারের বামেলা। নানান কাজের মধ্য থেকে যে সাত দিন সময় বের করে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আসব সে সুযোগও পাই না। নিজের দেশেরই কত জ্যাগা চিনি না, আজ পর্যন্ত দেখা হয়নি। বড়ো মেয়ে কাস্তাৰ বিয়ে হয়েছে বৱিশাল শহরেই, পাবলিক স্কুল রোডে বাড়ি। শুধু সিরাজউদ্দিন আহমদ এক সময় ওযুধ কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। শাস্ত্ৰি রোকেয়া বেগম, গৃহবধু। এখানে একবার যাবার সুযোগ হয়, সঙ্গে ছিল আমার ভাবী আয়েশা বেগম। আরো ছিল আমার ছেটো ছেলে শোভন এবং তার বুয়েটের বন্ধু আজম। বড়ো লক্ষে করে নদীপথে সারা রাতের জার্নি। সবাই শুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু আমার চোখে ঘূম ছিল না। সারা রাত জেগে ছিলাম। কেবিনের জানালা দিয়ে বিশাল কীৰ্তনখোলা নদীর রাতের সৌন্দর্য আর ভ্রমণের আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করছিলাম। মনে মনে ভাৰছিলাম নিজের দেশেরই অনেক কিছু দেখা হয়নি।

আমার মা সব সময় একটা কথা বলতেন, নাকি আসলের চেয়ে সুনের দায় বেশি। আমার মার নাতি নাতনীর সংখ্যা অনেক, আর এসব নাতি নাতনীর প্রসঙ্গ ধরেই কথাগুলো প্রায়ই বলেন। ছেলে মেয়েরা হচ্ছে আসল আর নাতি নাতনীর হচ্ছে সবাই সুদ, এ সুনের জন্যই নাকি মানুষের মায়া ময়তা বেশি। এখন মনে হচ্ছে কথাটা বোধ হয় ঠিক, কারণ কনক এতদিন ধরে আমাকে আমেরিকায় বেড়াতে যাবার জন্য বলে আসছে, আমার সময় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যেদিন পারিসা ফোনে বলল ‘দাদু আমেরিকা আসো’ সেদিনই মনস্থির করে ফেললাম আমি যাব। আমার সে যাবার কথা নিয়েই এ লেখালেখি।

ভিসা হাতে পাবার পর বাসায় এসে প্রথমেই ফোন করলাম আমার বোনের ছেলে খালেদ ইকবালের কাছে, ওর ডাক নাম সেলিম। সেলিমকে খুলে বললাম, শুনে খুব খুশি। সেলিমের আবাবা অর্থাৎ শামসুদ্দিন দুলাভাই মাস্কানেক আগেই আমেরিকা থেকে বেড়িয়ে এলেন। তাঁর বড়ো ছেলে ড. জাহিদ ইকবাল, ডাক নাম শামীম, আমেরিকার ইতিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওলজিতে পি-এইচ.ডি. করে এখন ইউনিভার্সিটি অফ নর্দান আইওয়া সিভার ফলস-য়ে প্রফেসর। শামসুদ্দিন দুলাভাই বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। তিনি তার ছেলের কাছেই বেড়াতে গিয়েছিলেন। আগেও একবার গেছেন সেবার দেশে ফিরে তিনি ভ্রমণ কাহিনী লেখেন, নাম দিয়েছিলেন ক্রেইজি হর্সের দেশে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এবাবাও লিখছেন বলে তার কাছে শুনেছি। ভ্রমণ কাহিনী লেখার জন্য আমাকেও তিনি উৎসাহিত করেছেন। সেলিম ওর পরিচিত ট্রাইলেন এজেন্টকে দিয়ে আমার টিকেটের সব ব্যবস্থা করে দিল। আমার যাওয়া ঠিক হল ২৪ ডিসেম্বর, ২০০২, বাত আটটা পঞ্চাশ মিনিটে। আমি KLM এর যাত্রী, KLM এর কোনো ফ্লাইট সরাসরি ঢাকায় আসে না তাই ওদের যাত্রীরা দুবাই পর্যন্ত আমীরাত এয়ারলাইন

এর ফ্লাইটে যায়। আমার যাবার ব্যবস্থা সেভাবে হল। দুবাইতে দুই ঘন্টা যাত্রাবিবরিতির পর KLM এর নিজস্ব ফ্লাইটে আমষ্টারডাম। সেখানে চার ঘন্টা যাত্রাবিবরিতি তারপর একটি ফ্লাইটে সরাসরি হিউস্টন। আমার এন্ট্রিপয়েট হিউস্টন হলেও আমি ইচ্ছে করলে এই টিকেটে ওখানকার ডোমেস্টিক ফ্লাইটে হিউস্টন থেকে অস্টিন পর্যন্ত যেতে পারতাম। এভাবে গেলে কনকের সুবিধা হত, কিন্তু আমি কনককে বললাম সরাসরি হিউস্টনে এসে আমাকে নিয়ে যেতে, সেভাবেই ব্যবস্থা হল।

এই প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি। এত দূরের পথ তাও আবার এক। আমার ছোটো ছেলে শোভন ভালো নাম মিসিউজামান মাহমুদ বুয়েটে এ বছর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। ছোটো মেয়ে শাওন ইয়াসমিন ও বুয়েটে ম্যাটেরিয়াল এন্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লেভেল ওয়ান টার্ম ওয়ান এর ছাত্রী। শাওনের প্রথম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। আমি এমন সময় বেড়াতে যাচ্ছি যখন ওদের দুজনেরই সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। ওদের দুজনেরই সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা একটা করে বিষয় বাকি আছে। এই প্রথম আমি ছেলে মেয়েদের পরীক্ষার সময় কাছে থাকছি না। কিন্তু উপায় নেই, বছরের এই সময়টিতেই কনকের অফিসে দীর্ঘ ছুটি থাকে। আমি না থাকলে রান্নার ব্যবস্থা কিভাবে হবে তাও একটি চিন্তার বিষয় ছিল। আমার স্বামী যে সব সময় সব ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে, বলল এত কিছু চিন্তা করলে তোমার আর কোনদিনই বেড়াতে যাওয়া হবে না। তাছাড়া ছেলে মেয়েরা সবাই বড়ো হয়ে গেছে, ওদের কথা চিন্তা কর না, তুমি চিন্তামুক্ত হয়ে নাতনীর কাছ থেকে বেড়িয়ে এস।

আমি আপ্লাহর নাম নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। আমার বেয়ান, কনকের শাশুড়ি তার গাড়িতে করে আমাকে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এল। আমার বোনের ছেলে শেখ আহমদ জামিল, ডাক নাম রিয়াদ, জিএমজি এয়ালাইস-য়ে একজন অফিসার। রিয়াদ এর আশ্মা, আমার বোন রুলি ভিকারগ্নেসো কলেজের অধ্যাপক এবং রিয়াদের আবু কামাল বক্স সরকারি কর্মকর্তা, যুগ্ম সচিব ছিল। এখন অবসর জীবন যাপন করছে। আমার যাবার দিন রাতে রিয়াদের ঢাকা বিমানবন্দরে ডিউটি ছিল। বিমানবন্দরের সকল আনুষ্ঠানিকতা সহজভাবে সেবে নিতে রিয়াদ আমাকে অনেক সাহায্য করল। আমি দূরদেশে এই প্রথম যাচ্ছি, একা যাচ্ছি ফলে রিয়াদের উপস্থিতিটিই আমার জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির কারণ ছিল অনেক।

আমেরিকায় যাচ্ছি, দেশটির নাম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এবং মহাদেশটির নাম আমেরিকা, তবু আমেরিকা বলতে আমরা প্রায়ই একটি দেশকে বুঝি। এই বিশাল প্রভাবশালী দেশের কাছে এ মহাদেশের বাকি দেশগুলোর পরিচয় অনেকখনি ছান হয়ে বাচ্ছে গেছে। সেই দেশে যাচ্ছি আমি। প্রথম বিদেশে যাচ্ছি এবং একা যাচ্ছি। মনের মধ্যে একটু তয় এবং অস্বস্তি ছিল না তা নয়। পরিচিত সকলে সাহস দিয়ে বলল কত অন্ন শিক্ষিত মহিলা একা আমেরিকা বেড়িয়ে আবার ফিরে আসছে, আর তুমি তো উচ্চ শিক্ষিত। তবে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের অনেকেই আমাকে সর্তক করে দিয়ে বলল, যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে সেটা দুবাই বিমানবন্দরে হতে পারে, অন্য কোথাও হবে না। আরো একটি ব্যাপারে সর্তক করে

দিয়ে বলল, কোনো বিমানবন্দরে যদি কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে সব সময় ইউনিফর্ম পরা লোকজনের কাছে সাহায্য চাইবে, অন্য কারো কাছে নয়।

চাকা থেকে ফ্লাইট যথাসময়ে ছাড়ল। আমার পাশে বাকি তিনটি সীটে বসেছিল একটি পরিবার যারা ডালাসে থাকে, এবার ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই অন্ন বয়সী। ওদের দুটো বাচ্চা, একটির বয়স চার বছর, আর ছোটোটি সাত আট মাসের হবে। আমার সঙ্গে সহজেই আলাপ জমে উঠল। এই প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি শুনে তারা আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করল। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম দুবাই বিমানবন্দরে তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা। তারা জুরিখয়ে চার পাঁচ দিন থেকে তারপর ডালাসে ফিরবে। তাছাড়া দুবাইতে তাদের যাত্রাবিবরিতি আট ঘন্টা সেকারণে রাতটুকু তারা হোটেলে থাকবে। তবু তারা আমাকে আর একটি দম্পত্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল যারা লভন হয়ে ডালাস যাবে। তবে তাদের যাত্রাবিবরিতি আমার মতই মাত্র দুই ঘন্টা। তারা আমাকে আশ্বাস দিল যে সাহায্য করবে।

দেশে কঞ্চেকবার প্লেনে চড়েছি তবে বিশাল জেট প্লেনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। মাঝে মাঝে কানে তালা লেগে আসছিল। দেশ থেকে যাবার আগে সেলিম আমাকে চুইংগাম চিবানোর পরামর্শ দিয়েছিল, এতে নাকি কানে তালা লাগে না। পরামর্শটি বেশ কাজে লাগল তা ঠিক।

দুবাই এসে পৌছালাম, পথের কিছুটা অংশ পার করলাম। যে দম্পত্তিটি আমাকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল তাদের কোলে আবার তিন চার মাসের ছোটো বাচ্চা। সেই বাচ্চা নিয়ে তারা এত ব্যস্ত ছিল যে আমি তাদের অনেক আগেই অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে ট্রান্সফার ডেকে এসে পৌছালাম। আমার ট্রান্সফার এজেন্টকে ভ্রমণের আগেই অনুরোধ করা হয়েছিল যে আমি মেহেতু প্রথম এবং একা ভ্রমণ করছি সুতরাং KLM যেন তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমার Meet and greet প্রোগ্রামের ব্যাপারে যত্নবান হয়।

দুবাই বিমানবন্দরে ধনী দেশের ছাপ সর্বত্র। চারিদিকে নানা রঙের আলো বলমল করছে। বিভিন্ন বাহ্য্য ও চাকচিক্য দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। হঠাৎ দেখি একজন মহিলা আমার দিকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। কাছে এসেই হাসতে হাসতে বলল আমি তোমাকে চিনি। তারপর নিজের পরিচয় দিল। আমি মিনু, হোম ইকনমিজ কলেজের ছাত্রী ছিলাম। এবার আমিও চিনতে পারলাম তাকে, আমরা এক সঙ্গেই কলেজে পড়তাম। কিন্তু এত তাড়াড়ার মধ্যে আলাপ করার সময় ছিল না। মুখে হাসি টেনে বললাম, আমি কাজল, নিশ্চয়ই আমরা দুজনকে চিনতে পেরেছি। এতক্ষণে দেখি পেলাম সেই দম্পত্তির যারা আমাকে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমার গেইট নং ১৮ জানতেই আমাকে একেবারে গেইট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এল। ১৮নং গেইটের ট্রান্সফার ডেকে গেলাম বোর্ডিং পাশ সংগ্রহের জন্য। ডেকে বসা মেয়েটিকে আমার পাসপোর্ট আর টিকেট এগিয়ে দিলাম। মেয়েটি কম্পিউটার খুটখাট করে পাশে বসা লোকটিকে বলল, কাজল তুইয়া, ট্রান্সফার ফাস্ট টাইম এন্ড এলোন, মি. আজিজ দিস ইজ ইওর জব। কিন্তু মি. আজিজ অন্য কাজে ব্যস্ত, এদিকে খেয়াল দেবার সময় নেই। অগত্যা মেয়েটি আমার কাগজপত্র সমেত বোর্ডিং পাশ আমার হাতে দিয়ে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। আমি হাতঘড়ির

দিকে তাকিয়ে দেখি মাত্র আধ ঘন্টা বাকি আছে প্লেন ছাড়তে। যথাস্থানে এসে দেখি লাইন দিয়ে সবাই লাউঞ্জে চুকচে। একজন ইউনিফর্ম পরা লোক একে একে সবার কাগজপত্র চেক করে তারপর ভেতরে চুকতে দিচ্ছে। এবার আমার পালা। লোকটি আমার পাসপোর্ট, টিকেট আর বোর্ডিং পাশ নিয়ে তারপর পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে খুলে দেখল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মম তোমার আমস্টারডামের ট্রানজিট ভিসা কই? আমিতো অবাক, আমিতো বিমানবন্দরের বাইরে যাব না সুতরাং আমার ট্রানজিট ভিসা কেন লাগবে? লোকটি আমার সমস্ত কাগজপত্র নিজের পকেটে রেখে আমাকে বলল, মম তুমি ওখনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আগে প্যাসেঙ্গার লিস্ট দেখি। সত্যি বলতে কি, আমার হাত পা ঘামতে শুরু করেছে। আমার সমস্ত কাগজপত্র ঐ লোকটির কাছে তার মানে আমি এখন শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছি!! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি আছে। আমি কয়েকবার লোকটির কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম আমার প্রেরেমটা কি সেটা আমাকে বল। কিন্তু লোকটি ঐ একই কথা, দেয়ার ইজ নো প্রেরেম। শেষবার লোকটি আমাকে বলল, মম তুমি আমাকে কেন বিরক্ত করছ? তোমাকে ওখনে দাঁড়াতে বলেছি তুমি তাই কর। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে আমার প্রচণ্ড রাগ লাগছে। এর মধ্যে দেখি আরো দুজন বিদেশী যাত্রী অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে তার সঙ্গে কথা বলছে। আমি একা নই একথা ভেবে একটু আশ্কৃত হলাম। আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। এ সময় আর একজন ইউনিফর্ম পরা লোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আগের লোকটি তার সঙ্গে কি কথা বলল আমি শুনতে পাইনি। এবার নতুন লোকটি আমাকে লাউঞ্জের ভিতরে নিয়ে বসাল এবং বলল, মম জাস্ট রিল্যাক্স। আবার সেই একই কথা, দেয়ার ইজ নো প্রেরেম। কিন্তু আমি রিল্যাক্স করতে পারছিলাম না দেখে লোকটি বলল, মম আই উইল নট ফ্লাই টিউইন্ডাউট ইউ। আমার অবস্থা দেখে লাউঞ্জে বসে থাকা একজন পাকিস্তানী মহিলা যাত্রী জানতে চাইল আমি কোথায় যাব। হিউস্টন যাব শুনে বলল আমিও হিউস্টন যাব, তুমি আমার সঙ্গে থাক। আমি মহিলাকে জিজাসা করলাম তাদের সবার ট্রানজিট ভিসা আছে কিনা। মহিলা জানাল আছে। আমার তখন ট্রান্ডেল এজেন্টের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। ট্রান্ডেল নিয়ে যাদের ব্যবসা তারা ট্রান্ডেলিং এর সর্বশেষ ব্যবস্থাগুলো খবর রাখবে না এটা কেমন কথা। আমার সামনে দিয়ে একে সবাই গিয়ে প্লেনে উঠছে আর এরা আমাকে বলছে রিল্যাক্স হয়ে বসে থাকতে। এবার আমি দরজার কাছে গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগের লোকটি তার পকেট থেকে আমার কাগজপত্র বের করে অন্য একজনের হাতে দিল। নতুন লোকটি সেগুলো হাতে নিয়ে কোথায় চলে গেল। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। প্লেন ছাড়ার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে আমি আমার কাগজপত্র হাতে পেলাম। সব যাত্রী উঠে গেছে প্লেনে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে প্লেনে চুকলাম। নিজের সীট খুঁজে নিয়ে কেবল বসেছি এমন সময় একজন এয়ার হোটেস একটা কাগজ হাতে নিয়ে প্রায় দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল, ভুইয়া কাজল, ট্রান্ডেলিং ফার্স্ট টাইম এন্ড এলোন? Yes, মুখে হাসি টেনে আমার কাছে জানতে চাইল আমার কোনো প্রেরেম হয়েছে কিনা। আমি আর কি বলব, শুধু বললাম, ইট ইজ ওভার। মহিলা বারবার বলল, তোমার আর যদি কোনো প্রেরেম হয় আমাকে বলবে, আমি তোমাকে হেল্প করব। আমি হেসে ধন্যবাদ জানালাম। আমার মনে প্রশ্নের কিন্তু শেষ হয়নি। আমার ট্রান্ডেল এজেন্ট জানিয়েছিল KLM এর যাত্রীদের জন্য ট্রানজিট ভিসা নাকি লাগে

না, নেদারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে KLM এর নাকি সেবকম ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানী যাত্রী যারা KLM যে ভ্রমণ করছে তারা কিন্তু ট্রানজিট ভিসা করেই যাচ্ছে, সুতরাং আমার ট্রান্ডেল এজেন্টের কথা সঠিক নয়। আবার ট্রানজিট ভিসা বাধ্যতামূলক হলে এ ভিসা ছাড়া কেবল যাত্রী তালিকা দেখে আমকে প্লেনে আরোহণ করতে অনুমতি দেবার কথাও হয়ত নয়। শুনেছি আমার ট্রান্ডেল এজেন্ট আমার এ হয়রানি জানার পরেও KLM যাত্রীদের ট্রানজিট ভিসা ছাড়াই টিকিট ইস্যু করে যাচ্ছে। তাদের কি হয়রানি হয়ে চলেছে আমি জানি না, তবে ঢাকা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়। ট্রানজিট ভিসা প্রয়োজন থাকলে এটা ছাড়া যাত্রীদের ভ্রমণ করতে দেয়া উচিত নয়। ভ্রমণের মধ্যপথে এ ধরনের সমস্যা যাতে না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। তবে আমি আমেরিকা থেকে KLM এর একই রুটে ফেরার পথে ট্রানজিট ভিসা করে নিয়ে এসেছিলাম। এ বিষয়ে বাকি কথায় পরে আসব।

আমার পাশের সব কয়টা সীট খালি ছিল তাই সারাটা পথ কখনো শুধু ঘুম দিয়েছি আবার কখনো জানালা দিয়ে রাতের দৃশ্য দেখেছি। নাতনীকে দেখতে যাচ্ছি, ছেলে মেয়েদের দেখতে যাচ্ছি সেই সেই আনন্দেই সময়টা পার হয়ে গেছে। এয়ার হোটেস্টি এর মধ্যে কয়েকবার এসে খোঁজ নিয়ে গেছে, জানতে চেয়েছে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা।

খুব ভোর বেলায় আমস্টারডাম এসে পৌছালাম। এবার বোর্ডিং পাশ কাছেই ছিল তাই নির্দিষ্ট গেইট খুঁজে পেতে দেরী হল না। এই ফ্লাইটে আমিই এখন একমাত্র বাংলাদেশী এই রুটে ভ্রমণ করছি। তবে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানী মহিলার সঙ্গে আলাপ হল যারা একা এবং একই রুটে আমেরিকা যাচ্ছে। দুবাই বিমানবন্দরে যে পাকিস্তানী মহিলা আমাকে সহানুভূতি দেখিয়েছিল তার সঙ্গে লাউঞ্জে আবার দেখা হল। আমাকে দেখে মুখে একটি নিচিতের হাসি ফুটিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম, তোমাকে ওরা এত পেরেশান করছিল কেন? প্লেনের ভিতরে তোমাকে খুঁজেছি কিন্তু দেখা পাইনি। একদমে এতগুলো কথা বলে তারপর থামল। তার আভ্যন্তরিকতা দেখে আমার একাকিন্তু দূর হয়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে নীচে গিয়ে হাত মুখ ধূমে ফ্রেস হয়ে এলাম। এখানে যাত্রাবিরতি চার ঘণ্টা, হাতে এখনো অনেক সময় আছে। আমরা দুজনে বিমানবন্দরে ডিউটি ফ্রি শপগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এ বিমানবন্দরটিও খুব বড়ো কিন্তু এখানে বাংলু চাকচিক্য চোখে পড়ল না। আজ পঁচিশে ডিসেম্বর তাই প্রায়ই শুনতে পাচ্ছিলাম, মেরী ক্রিস্টামাস, হ্যাত এ নাইস ডে। কয়েকজন এয়ার হোটেসকে দেখলাম সান্তা ক্লাই এর বোলানো টুপি মাথায় পরেছে। আমার সহযাত্রী পাকিস্তানী মহিলাটি ইচ্ছা প্রকাশ করল এক জোড়া স্যান্ডেল কিনবে। জুতার দোকানে ঢুকে একজোড়া স্যান্ডেল পছন্দ করাও হল, দাম আশি ইউএস ডলার। দাম শুনে দুজনেই ঘাবড়ে গেছি। মনে মনে ভাবলাম, দুই ফিতার এই স্যান্ডেলের দাম ডিউটি ফ্রি শপেই যদি এত বেশি হয় তাহলে বাইরের দোকানগুলোতে কি অবস্থা। মহিলা আমাকে জানাল তার কাছে মাত্র এক ডলার আছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে দোকান থেকে বের করে এনে বললাম তোমার এখানে কিন্তু কেনার দরকার নেই। মহিলার চাচাতো ভাই হিউস্টনে থাকে সেই ভাই তাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। মাত্র এক ডলার নিয়ে পথে বেরিয়েছে শুনে আমার অবাক লাগছে। আমি তুল শুনেছি কিনা সেটা যাচাই করতে আর ইচ্ছা হল না।

দুই.

এবার আমষ্টারডাম ছাড়ার পালা। লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সামনে তিনজন পাকিস্তানী মহিলা পর পর দাঁড়িয়েছে। তাদের মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে এমনভাবে চেক করল যেটা আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। দুই হাত দুই দিকে সমান করে ছাড়িয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত থাপড় মেরে মেরে দেখল, এমন কি অল্লবয়েসী মেয়েটির বুট জুতা খুলে ঝাকি দিয়ে দেখল। এবার আমার পালা। কাউন্টারে বসা লোকটির হাতে আমি আমার পাসপোর্ট আর টিকেট দিয়ে নিজেই হাত দুপাশে ছাড়িয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটি বলল, নো ময়, নট ইউ। আমি একবার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম পর মুহূর্তে ভাবলাম এত বোঝার কি প্রয়োজন। সোজা প্লেনে উঠে পড়লাম। আমার সীট ঠিক জানালার পাশে। আমার পাশের সীটে বসেছে একজন বয়স্ক আমেরিকান তার পাশে একজন অল্লবয়স্ক পাকিস্তানী ছেলে। আমাদের সীটগুলো ঠিক টয়লেটের পাশে, সেকারণে আমেরিকান ভদ্রলোক স্টুয়ার্টকে বলে সীট বদল করে চলে গেল। ভালোই হল মাঝখানের সীট খালি হওয়াতে একটু আরাম করে বসতে পারলাম। সকাল দশটায় প্লেন ছাড়লেও ঘন মেঘের কারণে বিমানবন্দরে সূর্যের আলো লেশমাত্র ছিল না।

যাত্রীদের নিয়ে মিনিট দশকের মধ্যেই KLM এর 747 বিমানটি মেঘ ভেদ করে আকাশে অনেক ওপরে চলে এল, মনে হল নীচে ঘন সাদা মেঘের স্তর, ওপরে নীল আকাশ, আর মাঝখানে সোনার থালার মত গোল সূর্য, সব কিছু কেমন চৃপচাপ। শুধু জেট প্লেনের একটানা গৌঁ গৌঁ শব্দ। প্লেনের ভেতরে সবাই চৃপচাপ বসে আছে। অনেকে আবার এর ভেতরে ঘুমিয়েও পড়েছে। কেবিন ড্রুরা এদিক ওদিক চলাফেরা করছে। আমার মনে হল আমি একদম একা। পুরু মেঘের কারণে নীচে কিছু দেখা যায় না, নীচে পৃথিবী হ্যাত আছে এবং হ্যাত জেগেও আছে। চারদিকে সূর্যের আলো বলমল করছে অথচ মেঘের কারণে সে আলো নীচে যায় না, মেঘে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। মনে হল নীচে মানুষের কোনো সূর্যের আলো পাবার অধিকার নেই। জানালা দিয়ে যতদূর দেখা যায় একমনে তাকিয়ে আছি। মনটা কেবল উদাস করা পরিবেশ, সব কিছু চৃপচাপ সুমসাম। আমার মনে হল, যেন আমি একা একজন দর্শক। মনে হল, স্বর্গ কি এরকমই হবে? একেবারে শব্দহীন, চৃপচাপ! মনে মনে আরো কত কথা এল আবার ভাসমান মেঘের মত চলেও গেল। হাসলামও, পৃথিবীর যে অবস্থা চারদিকে হানাহানি মারামারি তাতে স্বর্গ এরকম শূন্যই পড়ে থাকবে আর নরকে হ্যাত স্থান সংকুলান হবে না। কে জানে কি হবে?

ইন্টারনেটের যুগে কোনো দেশই এখন আর দূরে বলে মনে হয় না। প্রতিদিন ই-মেইলে ছেলে মেয়েদের খবর পাচ্ছি। প্রয়োজনে দিনে কয়েকবারও ই-মেইল করা হয় তাড়া টেলিফোনে কথা হয়। বুবাতে পারিনি কত দ্রুতে তারা আছে। ঢাকা থেকে রওয়ানা হবার আগেই কনকের একটি ই-মেইল পেয়েছিলাম। ও লিখেছে, আশা তুমি কোনো চিন্তা অপেক্ষা করছি। ঘুরে ফিরে সেই কথাই মনে হচ্ছিল বারবার। পাঁচ বছর পর কনককে দেখে। পারিস এতদিনে নিচ্ছয়ই অনেক বড়ে হয়েছে। এসব চিন্তায় পথের দূরত্ব প্রায়

ভুলেই গেছি। হিউস্টন বিমানবন্দরে প্লেন নামল। বুকের ভেতর বিশ্বয় ও চাপা উত্তেজনা, আমেরিকায় পৌছে গেছি।

ইমিশ্রেশন কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সামনেই সেই পাকিস্তানী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে যে দুবাই বিমানবন্দরে আমাকে বেশ আগম করে নিয়েছিল। আমাদের সবার হাতে পাসপোর্ট আর ইমিশ্রেশন ফরম, প্লেনে বসেই আমি এটা পূরণ করেছিলাম। একজন লোক এসে আমাদের ফরমগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল যে ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা। দেখা গেল সামনের মহিলার ফরম অর্ধেকই তখনে পূরণ করা হয়নি। মহিলা আমার সাহায্য চেয়ে বলল তোমার ফরমে যা যা লিখেছ সেগুলো দেখে আমার ফরমটি পূরণ করে দাও। আমি দেখলাম সেটা সম্ভব নয় কারণ দুজনের তথ্য এক নয়। অথচ এখন আমার উপকারের প্রতিদিন দেবার সময়। কি করা উচিত অথবা কিভাবে করা উচিত তা ঠিক বুবাতে পারছি না। আমি এ ব্যাপারে যে দক্ষ তাও নই। এর মধ্যে ইমিশ্রেশন কাউন্টার থেকে আমার ডাক পড়ল। যে লোকটি আমাদের ফরমগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল আমি তার কাছে মহিলাকে বুবিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলাম।

আমি কতদিন থাকব ইমিশ্রেশন অফিসার জানতে চাইল। আমি বললাম তিন থেকে চার মাস। আমার টিকেটের মেয়াদ ছিল চার মাস, অবশ্য নবায়ন করার সুযোগ ছিল। যাহোক, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি এখানে চাকুরি করব কিনা। তা না হলে আমার খরচ কে বহন করবে। তাকে জানালাম, আমার ছেলে এখানে চাকুরি করে আমি তার কাছেই এসেছি। সে আমার সকল খরচ বহন করবে। আমার সম্পর্কে নিচিত হয়ে আমার ছয় মাসের এন্ট্রি ভিসা মঙ্গল করা হল। এবার লাগেজ নেবার পালা। আমার লাগেজ বলতে কেবল একটি স্যুটকেস, সেটাও পেতে দেরি হল না। লাগেজ ট্র্যালারটি আস্তে আস্তে ঘুরছে আর যে যার মত নিজের ব্যাগ স্যুটকেস ট্র্যালার থেকে নামিয়ে নিচ্ছে। আমার অন্যন্য হাত, কিছুতেই স্যুটকেস বশে আনতে পারছিলাম না। স্যুটকেসটা এমন কিছু ভারী ছিল না। কিন্তু প্রথমবার ওটাকে সোজা করতেই আবার দূরে চলে গেল। দাঁড়িয়ে আছি, আবার যখন গুটি সামনে এল আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ভদ্রলোকটি একটানে আমার স্যুটকেসটা নামিয়ে দিল। তার কাছে সাহায্য না চাইতেই আমাকে সাহায্য করল। দেখে একটু অবাকও হলাম, একই সঙ্গে খুশিও হলাম। এভাবে সাহায্য পাওয়া সম্ভব তা আমার ধারণার মধ্যে ছিল না। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাশে দাঁড় করানো একটি খালি ট্রলিতে আমার স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিলাম। লোকটি বলল এটা আমার ট্রলি। আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। খেয়াল করে দেখলাম, একটু দূরেই সারি সারি ট্রলি দাঁড় করানো আছে। তাড়াতাড়ি একটি ট্রলি সেখান থেকে নিয়ে এসে তাকে দিলাম। সে আমাকে ধন্যবাদ জানাল।

এবার কাস্টমসের পালা। একজন কালো মোটাসোটা লোক বসে আছে। আমার কাছে খাবার কিংবা গুড় মশলা আছে কিনা জানতে চাইল। আমার কাছে খাবার ছিল না সুতরাং ছেড়ে দিল আমাকে। বিমানবন্দরের এবং ইমিশ্রেশনের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ, এর পরবর্তী অংশ শুরু হল আমেরিকার মাটিতে। আমার উদ্দেশ্যে ছিল এ আমেরিকাতেই

বেড়াতে আসা, কনককে পারিসাকে নাহিদকে দেখতে আসা। তারা আমার জন্য নিচ্ছয়ই কোথাও অপেক্ষা করছে, হিউস্টন বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই তাদের অপেক্ষারত পাব।

এবার এক্সিট দিয়ে ট্রলিটা হাতে নিয়ে বের হয়ে এলাম। নিশ্চিত জানি যে কনকরা এসেছে তবু আমার বিশ্বাস ও আনন্দ একত্রে জমে ছিল যে সামনে তাদের দেখব। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসার আগেই দেখে নিলাম কনক পারিসা আর নাহিদ হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কনক পরে কনককে দেখলাম, আমার কান্না পেল, আনন্দের কান্না। কনককে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি দেখে পারিসা একটু অবাক হয়েছে, তার কাছে এটা নতুন, হয়ত সেরূপ স্বাভাবিকও নয়। আমার আনন্দের কান্না থেমে গেলে কনক জানতে চাইল পথে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিম। দুবাই বিমানবন্দরের সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। কনকের মনেও একই প্রশ্ন, ট্রানজিট ভিসা বাধ্যতামূলক হলে দুবাই বিমানবন্দর থেকে ঢাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেবার কথা অথবা আমষ্টারডাম বিমানবন্দরে আমাকে থামিয়ে দেবার কথা, সেখান থেকে আমাকে তো ছেড়ে দিল। সেই মূহর্তে মনে হয়েছিল দুবাই বিমানবন্দরে বাংলাদেশী যাত্রীদের নামারকম নাজেহাল হবার কাহিনী আছে। আমার ব্যাপারটিও সেরূপ কোনো ঘটনা হবে হয়ত। যাহোক, আঙ্গাহ্র রহমতে ভালোভাবে পৌছে গেছি স্টোই বড়ো কথা। হিউস্টন বিমানবন্দরের নিজস্ব বাসে করে দূরে পার্কিং লটে এসে নামলাম, সেখানে কনকের লাল রঙের গাড়িটা পার্ক করা ছিল। কনক ড্রাইভিং সীটে আর নাহিদ পাশের সীটে বসা। পারিসা আর আমি পিছনের সীটে বসেছি। গাড়ি স্টার্ট নেবার পর অস্টিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম আমরা, আমি এখন আমেরিকার মাটিতে এবং কনকদের সঙ্গে, আমার জন্য এটা বিশ্ব। লক্ষ্য করলাম এ পাঁচ বছরে কনকরা এখানকার ছোটো বড়ো সকল নিয়ম কানুনে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। হিউস্টন থেকে অস্টিনে আসতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। এর মধ্যে কনক দুই বার গাড়ি থামিয়ে কফি কিনল এবং গ্যাস নিল। বাইরে বেশ জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল কিন্তু গাড়ির মধ্যে বসে একটু ও টের পাছিলাম না। সুন্দর মসৃণ ঝাকবকে চওড়া রাস্তা। একবার গাড়ি থামিয়ে টোল দিতে হল। এখানে যেসব রাস্তা সরকারিভাবে তৈরি সেখানে টোল দিতে হয় না কিন্তু বেসরকারিভাবে তৈরি রাস্তায় যাতায়াতের সময় টোল দিতে হয়।

রাস্তার দুপাশে মাইলের পর মাইল শুধু খালি মাঠ অথবা ঝাউবন। ঝাউগাছ ছাড়াও আরো অনেক বড়ো গাছ আছে। এখন শীতকাল, ঝাউগাছ ছাড়া বাকি সব গাছের পাতা ঝরে গেছে, গাছগুলো শীতের সাক্ষী হয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি কি গাছ চেনার উপায় নেই, আমি চিনতে পারিনি। কিছু কিছু গাছে পাতাও দেখলাম এগুলো আমার পরিচিত গাছ নয়। কনক বারবার আমাকে আফসোস করে বলছিল, আশা তুমি এমন সময় এসেছ যখন গাছে পাতা নেই, সব ন্যাড়া হয়ে আছে। সামান্য পরেই এপ্রিল মাস থেকে এসব গাছে পাতা ও ফুল ভরে যায়, মাঠগুলোও ফুলে ফুলে হেয়ে যায়।

আমাদের মিরপুরের বাসায় কনক সখ করে একটি ঝাউ গাছ কিনে এনে লাগিয়েছিল। সেই গাছটি এখন প্রায় তিন ফুটের মত উঁচু হয়েছে। এই গাছটি আসলে পাতাবাহার প্রজাতির, আমাদের দেশে এগুলো সৌখিন গাছ। সখ করে লাগানো হয়। হিউস্টন থেকে রাস্তায় দেখলাম, এক ফুট থেকে শুরু করে দশ বারো ফুট উচু ঝাউগাছ, বিল যথেই বড়ো হচ্ছে। পথের দুপাশে কয়েকটি র্যাপ্শ চোখে পড়ল। আমাদের দেশে যাকে কৃষি খামার বলা হয়

র্যাপ্শ অনেকটা সে ধরনের, অনেক বড়ো, দুয়ের মধ্যে তুলনা নেই। খুব দূরে কয়েকটি বাড়ি চোখে পড়ল, আমাদের দেশে গ্রাম যেভাবে ঠিক সেভাবে নয়। হিউস্টন থেকে অস্টিন আসার পথে এত খালি জায়গা পড়ে আছে, টেক্সাসের বাকি এলাকা তো পড়েই রইল। আমার চোখে এগুলো একেবারেই নতুন, এভাবে কল্পনা করতে পারিনি কখনো।

কনকের বাসায় এসে পৌছালাম বিকাল পাঁচটায়। সুন্দর বাসা, তেমনি সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজানো। মাঝে মাঝেই ভুলে যাচ্ছি আমি এখন কোথায়। কখনো বিশ্বাস হতে চায় না আমি এখন, এই মুহর্তে আমেরিকায় আছি। দুই দিন ধরে পথে পথে রয়েছি, শরীরটা ঝুঁত লাগছিল। হলুকা গরম পানি দিয়ে গোসল করে নামাজ পড়লাম। বাসায় একটি জিনিস খুব ভালো লাগল, দেখলাম সারা মাসের নামাজের সময়সূচির প্রিন্ট কপি ফিজের গায়ে লাগানো আছে।

আমি আসব বলে কনক আর নাহিদ কয়েক দিন ধরে নানান ধরনের খাবার রান্না করে রেখেছে। বাংলাদেশে যা পাওয়া যায় তা প্রায় সবই আছে। খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছি, ভাবছি কেন আমাদের দেশের লোকেরা আসার সময় রান্না বান্না করা খাবার নিয়ে আসে আর বিমানবন্দরে মিথ্যা কথা বলে অথবা ধরা পড়ে নাজেহাল হয়। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্বাম নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম রাতের অস্টিন শহরে দেখতে। বড়দিন উপলক্ষে শহরের নানা জায়গা আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। বিশেষ করে ডাউনটাউন এলাকা। অস্টিন শহরটা পাহাড়ী এলাকায়, মেশির ভাগ আবাসিক বাড়ি ঘর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অবস্থিত, গাছপালার আড়ালে দিনের বেলা এর সবটুকু চোখে পড়ে না। দিনের বেলা এ জায়গাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। রাতের বেলায় যখন সবখানে আলো জলে উঠল তখন বুরুলাম শহরটা কত বড়ো। শহরের মধ্যে ছাড়ানো ছিটানো প্রচুর খালি জায়গা, মাঝখান দিয়ে একে বেঁকে রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুপাশে হয় পাহাড় অথবা ঝাউবন। একদিকে সময়ের উচ্চে যাওয়া অপরদিকে রাস্তার ঝাঁকি, আমি মাঝে মধ্যেই গাড়িতে ঘুমিয়ে যাচ্ছিলাম। কনক একবার গাড়ির গতি খুবই কমিয়ে দিয়ে আমাকে সামনের দিকে দেখতে বলল। প্রথমে আমি বুরাতে পারিনি, হাঁত খেয়াল করে দেখলাম একটি হরিণ রাস্তার ডান পাশের বোপ থেকে বের হয়ে আস্তে ধীরে রাস্তা পার হয়ে বাম দিকের ঝাউবনে চুকে পড়ল। এরকম দৃশ্য অবশ্য পরে আরো অনেকবার দেখেছি। হরিণ, খরগোশ, কাঠবেড়ালী সব সময়েই দেখেছি নির্ভয়ে খেলা করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসকল জীবজুত পাখ পাখালি ধরা তো দূরের কথা, গাছের ডাল পর্যন্ত কেউ ভাসে না।

চোখ মেলে সব কিছু দেখার আগ্রহ অনেক বড়ো করে ছিল কিন্তু ভ্রমণের ঝাঁকি দূর করতে পারছিলাম না, বারবারই চোখ বক হয়ে আসছিল। বাসায় ফিরে সোজা বিছানায়, তারপর গতীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সকালে ঘুম ভাঙল যখন বেলা দশটা বাজে। ঘুমের আচ্ছন্নতা কেটে চোখ খুলতেই দেখি পারিসা আমার পাশে ঘুমাচ্ছে। কখন যে আমার পাশে কনক ওকে এনে শুইয়ে রেখে গেছে আমি টের পাইনি। দাদী হিসাবে এটা আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা, অত্যন্ত আনন্দেরও। ইচ্ছা করেই আরো আধা ঘণ্টা শুয়ে থাকলাম। ছুটির দিন তাই কনক বাসাতেই আছে। পারিসার আর আমার ঘুম থেকে ওঠার আগেই কনক

নাহিদকে একটি শপিং মল-য়ে রেখে এসেছে। নাহিদ অনেক সময় ধরে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু কেনাকাটা করবে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নাহিদকে আনতে গেলাম। এখানকার শপিং মলগুলো এত বড়ো যে না দেখলে বোঝা যায় না। এখানে ভালোমত দেখেওমে ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতে গেলে পুরো এক দিনেও কুলাবে না। যেসব মেয়ে চাকুরি করছে না বা পড়াশোনা করছে না তাদের সময় কাটনোর জায়গা এ শপিং মলগুলো। তারা প্রায় দিনই এসব জায়গায় এসে ঘুরে ঘুরে জিনিস দেখে বেড়ায়, কখনো পসন্দসই জিনিস কেনে আবার কখনো কেবল দেখেই সময় কাটায়। শপিং মলগুলোতে প্রতিদিন একাধিক জিনিসের ওপর সেল থাকবেই। আর সেল দিতেও সময় লাগে না। ডিসেম্বরের সাতাশ তারিখে দেখলাম ক্রিসমাসের জন্য তৈরি জিনিসগুলো সেল দিয়েছে। এছাড়া জুতা, শার্ট, ব্যাগ, গরম কাপড় সব জিনিসের সেল লেগেই আছে। যে জুতার দাম আশি ডলার সেই জুতা সেলে পাওয়া যাবে বিশ ডলারে। যে শার্টের দাম চালুশ ডলার সেলে সেটা পাওয়া যায় দশ ডলারে। আমার মনে হয় একমাত্র চলচ্ছিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরাই আসল দাম দিয়ে সময় মত জিনিস কেনে, বাকি সবাই সেলের অপেক্ষায় থাকে। আমাদের দেশের মেয়েরা দেখা যায় বিভিন্ন মলে ঘুরে ঘুরে সেলে পসন্দমত জিনিস কিনে রেখে দেয়। এরপর যখন দেশে বেড়াতে আসে তখন আঞ্চলিক স্বজনকে সেগুলো উপহার হিসাবে দিতে পারবে। একবার একটি জুতার দোকানে দেখি সেলে মাত্র চার ডলারে এক জোড়া জুতা বিক্রি হচ্ছে। নাহিদ বলল, মনে হয় এই ডিজাইনের বাকি সব জুতা বিক্রি হয়ে গেছে। মাত্র এক জোড়াই পড়ে আছে তাই বিনা পয়সায় না দিয়ে মাত্র চার ডলারেই ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশের তুলনায় ওখানে সেল অনেক পৃথক, ওখানে সেল অর্থই খারাপ জিনিস তা নয়। প্রায়ই কোনো জিনিস মডেল বা ফ্যাশন বদলে গেলে তা সেলে চলে আসে, কোনো সামগ্রী বিক্রির পর অল্প কিছু টকে থাকলে তাও সেলে চলে আসে, সেরকমই শুনতে পেলাম।

এখানে কেনাকাটা করতে গিয়ে আমার বেশ অসুবিধা হয়েছে। যে জিনিসই কিনতে গেছি প্রথমেই সেটার মূল্য ডলার থেকে টাকায় পরিবর্তন করে নিয়েছি। ব্যস, তখনই আমার কাছে মনে হয়েছে এ যে দেখি সোনার দাম। আমাদের দেশে জিনিসের এত দাম নেই। ওখানে কোনো জিনিস কেনার ইচ্ছা চলে গেছে। কয়েকবার এরকম হবার পর কন্ক আমাকে বলল, আমা তুমি ডলারকে কেন টাকায় বদলে নিছ, এভাবে জিনিস কিনতে গেলে কোনোদিনই কিছু কিনতে পারবে না। এখানে এক ডলার আমাদের কাছে এক টাকা। একটি শার্ট কিনতে গেলাম, দেখলাম মূল্য লেখা আছে চালুশ ডলার। চালুশ ডলারকে টাকায় বদলে নিলে ওটার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় আড়াই হাজার টাকার কাছাকাছি। এরকম শার্ট আমাদের দেশে এক হাজার টাকার বেশ কমে পাব তা নিশ্চিত। এত চড়া দাম দিয়ে এখান থেকে শার্ট কিনে নিয়ে যাবার কোনো অর্থ হয় না। পরে অবশ্য এরকম দুটো শার্ট অন্য মল থেকে সেলে কিনেছি, একটির দাম পড়েছে পেনোরো ডলার, অন্যটির দাম দশ ডলার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমেরিকা থেকে যত জিনিস কিনেছি তার নবাবই ভাগই আমেরিকার বাইরে তৈরি। বেশির ভাগ জিনিসের গায়ে লেখা মেড ইন চায়না। এছাড়া ভাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড ইত্যাদি তো আছেই। শাক সবজী মাছ ইত্যাদি বেশির ভাগই আসে মেক্সিকো থেকে। ফিয়েন্টা নামে একটি মেক্সিকান দোকান আছে কন্ক সেখান থেকেই টাটকা মাছ কেনে। এ দোকানে এমন মাছ নেই যা

পাওয়া যায় না। বড়ো বড়ো জার, এর মধ্যে ছাড়া থাকে মাওর তেলাপিয়া চিংড়ি ইত্যাদি মাছ। মরা মাছ এক পাউডের দাম এক ইউএস ডলার। আবার তাজা মাছ প্রতি পাউড তিন ইউএস ডলার। কন্ক এখানে আসে তাজা মাছ কেনার জন্যই। দোকানের এক পাশে বড়ো একটি জারে গোল গোল এক ধরনের মাছ ভর্তি করা আছে। এগুলো দেখে আমি ঠিক চিনতে পারছিলাম না, কন্ক বলল এগুলো অঞ্জোপাশের বাচ্চা। অনেক মেক্সিকানকে দেখলাম, অঞ্জোপাশের বাচ্চা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাজা তেলাপিয়া মাছ কিনলাম। যে মেয়েটি মাছগুলো কেটে দিল কন্ক তাকে এক ডলার বকশিস দিল। মেয়েটি ডলার নিতে একটু ইতস্তত করছিল, কন্ক তাকে একপ্রকার জোর করেই দিল। কন্ক বলল এখানে বকশিস দেবার নিয়ম নেই কিন্তু এরা এত গরীব যে এই একটি ডলার ওর জন্য অনেক কিছু। ফিয়েন্টা দোকানের সামনের ফুটপাথে মেক্সিকানরা নানা রকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে অঙ্গীয়া মাকেট বসিয়েছে। খুব সস্তা সস্তা জিনিস এখানে পাওয়া যায়। শুনলাম মেক্সিকান লেবাররা দেশে বেড়াতে যাবার সময় এখান থেকেই কেনাকাটা করে।

একদিন কনকের বাসায় তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম এখানকার কেনাকাটা নিয়ে। তার এক বন্ধু বলল, একবার এখান থেকে সে নাকি একটি শার্ট কিনেছিল যেটার গায়ে লেখা ছিল মেড ইন বাংলাদেশ। একথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, সর্বনাশ! আমি আমার ছেটো ছেলে শোভনের জন্য যে শার্ট কিনেছি সেটা যদি বাংলাদেশের তৈরি হয় তাহলে সবাই হাসাহসি করে বলবে এত দূর থেকে বাংলাদেশী শার্ট বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দামে কিনে আবার বাংলাদেশেই বহন করে আনার কোনো দরকার ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা খুলে শার্ট বের করে দেখি একেবারে কানের কাছ দিয়ে চলে গেছে। শার্টের গায়ে লেখা মেড ইন শ্রীলঙ্কা।

অষ্টিনে শাহী নামে একটি দোকান আছে যেটার মালিক একজন বাংলাদেশী ছেলে। তার বট অবশ্য আমেরিকান। বটটি সব সময় কাউন্টারে বসে থাকে আর ছেলেটি দোকানে মাল আনা নেয়া থেকে শুরু করে অন্য সব কাজে ব্যস্ত থাকে। এই দোকানে বাংলাদেশের নাটক ও বাংলা সিনেমার ক্যাসেট থেকে শুরু করে বাংলাদেশের তৈরি জুই নারিকেল তেল, কেয়া সাবান, নানা ব্রাউনের গুড়া মশলা ইত্যাদি সহ আরো অনেক বাংলাদেশী জিনিস পাওয়া যায়। অষ্টিনে এমন বাংলাদেশী অনেককে দেখেছি যারা সব সময় বাংলাদেশী সাবান ব্যবহার করে। একবার নাহিদ শাহী দোকান থেকে এক ডলার দিয়ে ছয়টা পান কিনল। আমি নাহিদকে বললাম, ছয়টা পানের দাম এক ডলার তার মানে একটি পানের দাম পড়ল দশ টাকার কাছাকাছি।

এয়ারপোর্ট হ্যাতেন নামে অষ্টিনে একটি রেস্টুরেন্ট আছে যার মালিক একজন বাংলাদেশী। বাংলাদেশীদের খুব প্রিয় জায়গা এই এয়ারপোর্ট হ্যাতেন। একটি দোতলা ভবনে এই রেস্টুরেন্টটি অবস্থিত। একটি ভবনের নাচতলায় এ রেস্টুরেন্ট আর দোতলাটি বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। সাতার নামে একজন সিলেটী এখানকার কুক। সাতারের চিকেন টিক্কা আর নান এখানে বাংলাদেশীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এখানে চিকেন টিক্কা আর নান একেবারে আমার খাবার সুযোগ হয়েছে। আমেরিকায় বসে বাংলাদেশীর হাতে প্রস্তুত বাংলাদেশী খাবার মনে রাখার মত, অনেকেই ভোলে না, আমিও ভুলিনি।

তিম.

আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ডালাস নামে একটি ইংরেজি সিরিয়াল দেখানো হত। সে সময়ে সিরিয়ালটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ল্যারি হ্যাগম্যান, ডিষ্ট্রিভারিয়া প্রিসিপাল, প্যাট্রিক ড্যাফি সহ হলিউডের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখানে অভিনয় করেছিল। বলা যেতে পারে আমার প্রথম আমেরিকা দেখা ডালাস ছবিটির মাধ্যমে। খুব উচু উচু সব বিস্তিৎ তাও আবার কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সুপ্রশস্ত দীর্ঘ সব রাস্তা, দোতলা তিনতলা সব ফ্লাইওভার। সে এক অপূর্ব জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ। বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাফ। আমেরিকা বলতে আমার চোখে ডালাস এর দৃশ্যই ভেসে উঠত। টেক্সাসের রাজধানী অস্টিন হলেও বাণিজ্যিক শহর হিসাবে ডালাসের গুরুত্ব এবং ব্যস্ততা বেশি। ডালাসে কনকের বেশ কয়েকজন বঞ্চ থাকে। বলতে গেলে সবাই বুয়েটের বক্স। এর মধ্যে সালামত ক্রুল থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সহপাঠী। সালামত আর ওর বট নীপা দুজনেই বুয়েট থেকে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকায় আসে এম. এস. করতে। টেক্সাসের আর্লিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. করার পর দুজনেই দুটো ভালো কোম্পানীতে চাকুরি করছে। এছাড়া কনকের আরো একজন ব্রিংকু, সেও ডালাসে থাকে। বিংকু বুয়েটে কনকের সহপাঠী ছিল, আহসানউল্লাহ হলে তার কুম্হেটও ছিল। আঠাশ ডিসেম্বর সকাল দশটার দিকে আমরা অস্টিন থেকে ডালাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রাতে সালামতের বাসাতেই থাকব, পরের দিন রিংকু এবং আরো কয়েকজনের বাসায় বেড়িয়ে বিকেলে অস্টিনে ফিরে আসব এটাই ছিল আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম। অস্টিন থেকে ডালাস যেতে ঘট্টা তিনেক লাগে। পথে বারবার মনে হচ্ছিল সেই বিখ্যাত ডালাস ছবির কথা, দৃশ্যগুলো যেন সামনে ভাসছিল। ভাবছিলাম কখন দেখব সেই পরিচিত পরিবেশ। সেই বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাফ দেখা কি সম্ভব? কনককে মনের কথাটা খুলে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলল অবশ্যই দেখা যাবে। নাহিদ ম্যাপ বের করে দেখল সাউথ ফর্ক র্যাফ ডালাসের কোন দিকে, ম্যাপে চিহ্নিত করা গেল। ঠিক হল দুপুরের পর র্যাফে যাব। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম। পথে আরো কয়েকটি র্যাফ চোখে পড়ল। একটি জায়গায় এসে কনক বলল, ডান দিক দিয়ে কিছু দূরে গেলেই প্রেসিডেন্ট বুশ এর র্যাফ। হিউটন থেকে অস্টিনে আসার পথে যেমন দেখেছিলাম এখানেও অস্টিন থেকে ডালাস যাবার পথে প্রায় একই প্রকারের দৃশ্য চোখে পড়ল। দৃশ্যটি হল অনেকগুলো র্যাফের অবস্থান, তাছাড়া রাস্তার দুপাশে মাইলের পর মাইল খালি জায়গা। খুব দূরে দূরে দুয়েকটি বাড়ি চোখে পড়ে। আমাদের দেশেও হাইওয়ের দুপাশে বসতবিহীন বিস্তীর্ণ মাঠ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো সবুজে তরা, সবখানেই ধান পাট বা সবজী ক্ষেত, অনাবাদী কিছু পড়ে নেই। কিন্তু এখানকার খালি জায়গায় কোনোদিন চাষবাস হয়নি তা দেখেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের তুলনায় দৃশ্যগুলোই মনে ভাসছিল বলে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে এভাবে বিস্তীর্ণ জায়গা অনাবাদী ফেলে রাখার অর্থ হল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, সেই মুহূর্তে এটাই মনে হল। আমাদের দেশের হাজার হাজার কৃষক পরিবারকে এসকল স্থানে বসতি গড়তে দিলে টেক্সাসের স্থূল অংশও ভরবে না।

এখানে রাস্তার দুপাশে কিছু দূর পর পরই গ্যাস স্টেশন আছে। গ্যাস স্টেশনগুলোর সঙ্গে আবার স্টেশনারী দোকান আছে, সেখানে প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিস পাওয়া যায়। এছাড়া ম্যাকডোনালডস এর মত নামী দামী রেস্টুরেন্টগুলো কিছুদূর পরপরই চোখে পড়ে। বড়ো বড়ো মলগুলো থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো স্টেশনারী দোকান, গ্যাস স্টেশনে, রেস্টুরেন্টে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। এখানে একজন ব্যক্তি নিজের বাসায় যেসব সুবিধা ভোগ করে রাস্তায় বের হলে সেসব সুবিধার কোনোটি থেকেই সে বিশ্বিত হয় না।

বেলা একটার দিকে রাস্তার পাশে ম্যাকডোনালডসে আমরা দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। কনক পথে একবার গ্যাস নিল এবং কফি কিনল। কখন যে ডালাসে পৌছে গেছি তা খেয়াল করিন। কনক বলতে লক্ষ্য করলাম দূরে ডালাসের ডাউনটাউনের সুউচ্চ দালানগুলোর চূড়া দেখা যাচ্ছে। যতই এগোছিছ ততই মনে হচ্ছে এগুলো সব আমার চেনা। সে এক অন্য ধরনের অনুভূতি, অন্য ধরনের আনন্দ।

ডালাসে ফ্লাইওভারের সংখ্যা অনেক। প্রশংস্ত রাস্তাগুলো বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভারের ভেতর দিয়ে প্যাংচ খেয়ে বের হয়ে এমনভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমার কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। কনক যে কিভাবে রাস্তা চিনে বের হয়ে যাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আমার অবাকই লাগছিল। কনক বলতে বুললাম এখানে কেউ আগে থেকে রাস্তা চিনে আসে না। রাস্তার পাশে বা ওপরে ঝুলানো অবস্থায় কিছুদূর পর পর যে সাইনবোর্ডগুলো আছে সেগুলোই পথচারীদের বা মোটর আরোহীদের রাস্তা চিনিয়ে গত্তব্যে পৌছে দেয়। এটা অভ্যাসের ব্যাপার অল্পদিনেই আয়ত্তে এসে যায়। রাস্তাগুলো এত সুন্দর ও মসৃণ যে গাড়িতে চলার সময় কোনোরকম ঝাঁকুনি লাগে না। এখানকার রাস্তাগুলোও যেন দেখার মত। ডাউনটাউন পার হয়ে অনেকদূর আসার পর আমরা একদম ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। কিছুদূর পর পর কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা মাঠ চোখে পড়েছে। বোঝা যায় এসব মাঠ সম্ভবত কোনো না কোনো র্যাফের অংশ। এরপর ম্যাপ দেখে খুঁজে বের করা হল সেই বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাফ। র্যাফের কাছে এসে আমি বুললাম চল এবার ফেরা যাক। কনক অবাক হয়ে বলল, কেন ভেতরে চুক্তে না? আমি তার চেয়েও অবাক হয়ে বুললাম অনুযাতি ছাড়া অন্যের এলাকায় চুক্তে দেবে? তারপর কনক যা বলল তাতে বুললাম যে ডালাস টিভি সিরিয়ালটি তৈরি শেষ হবার পর 'সাউথ ফর্ক র্যাফ' এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট স্পট। এখানে ডলার দিয়ে টিকেট কেটে ভেতরে চুক্তে হয়। পরে অবশ্য আরো জেনেছি, কিছু কিছু দেখেওছি যে আমেরিকায় এরকম হাজারো ট্যুরিস্ট স্পট আছে। এরা ব্যবসা জানে। অতি সাধারণ জিনিসকে এরা অসাধারণ বানিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে হাজার হাজার ডলার উপর্যুক্ত করে। আমরা ডান পাশের রাস্তা দিয়ে র্যাফের চুক্তে পড়লাম। এটা সেই রাস্তা যেখান দিয়ে জে. আর. বি. গাড়ি চালিয়ে র্যাফের আসত। একটি বড়ো বাড়ির সামনে এসে গাড়ি পার্ক করা হল। বাড়িটির মাথায় বড়ো বড়ো করে লেখা South Fork Ranch. কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে চুক্তলাম। বিভিন্ন স্থুভেনির দিয়ে সাজানো প্রশংস্ত হল ঘর, ছোটো ছোটো মনোযোগ থেকে শুরু করে টেক্সাসের কাউবয়দের পোশাক, রকিং চেয়ার, এমন কি খাঁটি পর্যন্ত সাজানো আছে বিক্রির জন্য। সুন্দর সুন্দর গহনা ব্যাগ জুতো সবই আছে। নাহিদ আমাকে সাউথ ফর্ক র্যাফ লেখা মনোগ্রাম আর কয়েকটি সুন্দর বলপেন কিনে দিল। এসব জায়গায় বেড়াতে এলে সকলেই কিছু না কিছু কেনে তাই জিনিসের দামও একটু বেশি থাকে। এ হলঘরটি পেরিয়ে একটি করিডোর

তিনি।

আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ডালাস নামে একটি ইংরেজি সিরিয়াল দেখানো হত। সে সময়ে সিরিয়ালটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ল্যারি হ্যাগম্যান, ভিট্টোরিয়া প্রিসিপাল, প্যাট্রিক ড্যাফি সহ হলিউডের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা এখানে অভিনয় করেছিল। বলা যেতে পারে আমার প্রথম আমেরিকা দেখা ডালাস ছবিটির মাধ্যমে। খুব উচু উচু সব বিভিন্ন তাও আবার কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সুপ্রশস্ত দীর্ঘ সব রাস্তা, দোতলা তিনতলা সব ফ্লাইওভার। সে এক অপূর্ব জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ। বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ। আমেরিকা বলতে আমার চোখে ডালাস এর দৃশ্যই ভেসে উঠত। টেক্সাসের রাজধানী অস্টিন হলেও বাণিজ্যিক শহর হিসাবে ডালাসের গুরুত্ব এবং ব্যস্ততা বেশি। ডালাসে কলকের বেশ কয়েকজন বন্ধু থাকে। বলতে গেলে সবাই বুয়েটের বন্ধু। এর মধ্যে সালামত ক্ষুল থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সহপাঠী। সালামত আর ওর বউ নীপা দুজনেই বুয়েট থেকে কম্পিউটার সাইঁস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকায় আসে এম. এস. করতে। টেক্সাসের আর্লিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. করার পর দুজনেই দুটো ভালো কোম্পানীতে চাকুরি করছে। এছাড়া কলকের আরো একজন বন্ধু রিংকু, সেও ডালাসে থাকে। রিংকু বুয়েটে কলকের সহপাঠী ছিল, আহসানউল্লাহ হলে তার রুমমেটও ছিল। আঠাশ ডিসেম্বর সকাল দশটার দিকে আমরা অস্টিন থেকে ডালাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রাতে সালামতের বাসাতেই থাকব, পরের দিন রিংকু এবং আরো কয়েকজনের বাসায় বেড়িয়ে বিকেলে অস্টিনে ফিরে আসব এটাই ছিল আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রাম। অস্টিন থেকে ডালাস যেতে ঘন্টা তিনেক লাগে। পথে বারবার মনে হচ্ছিল সেই বিখ্যাত ডালাস ছবির কথা, দৃশ্যগুলো যেন সামনে ভাসছিল। ভাবছিলাম কখন দেখব সেই পরিচিত পরিবেশ। সেই বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ দেখা কি সম্ভব? কনককে মনের কথাটা খুলে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলল অবশ্যই দেখা যাবে। নাহিন ম্যাপ বের করে দেখল সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ ডালাসের কোন দিকে, ম্যাপে চিহ্নিত করা গেল। ঠিক হল দুপুরের পর র্যাঞ্চে যাব। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। পথে আরো কয়েকটি র্যাঞ্চ চোখে পড়ল। একটি জায়গায় এসে কনক বলল, ডান দিক দিয়ে কিছু দূর গেলেই প্রেসিডেট বুশ এর র্যাঞ্চ। হিউস্টন থেকে অস্টিনে আসার পথে যেমন দেখেছিলাম এখানেও অস্টিন থেকে ডালাস যাবার পথে প্রায় একই প্রকারের দৃশ্য চোখে পড়ল। দৃশ্যটি হল অনেকগুলো র্যাঞ্চের অবস্থান, তাছাড়া রাস্তার দুপাশে মাইলের পর মাইল খালি জায়গা। খুব দূরে দূরে দূরেকটি বাড়ি চোখে পড়ে। আমাদের দেশেও হাইওয়ের দুপাশে বসতিবিহীন বিস্তীর্ণ মাঠ দেখতে পাওয়া যায় কিছু সেগুলো সবুজে ভরা, সবখানেই ধান পাট বা সবজী ফেত, অনাবাদী কিছু পড়ে নেই। কিন্তু এখানকার খালি জায়গায় কোনোদিন চাষবাস হয়নি তা দেখেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের তুলনায় দৃশ্যগুলোই মনে ভাসছিল বলে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল যে এভাবে বিস্তীর্ণ জায়গা অনাবাদী ফেলে রাখার অর্থ হল প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, সেই মুহূর্তে এটাই মনে হল। আমাদের দেশের হাজার হাজার কৃষক পরিবারকে এসকল স্থানে বসতি গড়তে দিলে টেক্সাসের ক্ষুদ্র অংশও ভরবে না।

এখানে রাস্তার দুপাশে কিছু দূর পর পরই গ্যাস স্টেশন আছে। গ্যাস স্টেশনগুলোর সঙ্গে আবার স্টেশনারী দোকান আছে, সেখানে প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিস পাওয়া যায়। এছাড়া ম্যাকডোনাল্ডস এর মত নামী দামী রেস্টুরেন্টগুলো কিছুদূর পরপরই চোখে পড়ে। বড়ো বড়ো মলগুলো থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো স্টেশনারী দোকানে, গ্যাস স্টেশনে, রেস্টুরেন্ট ট্যালেটের ব্যবস্থা আছে। এখানে একজন ব্যক্তি নিজের বাসায় যেসব সুবিধা তোগ করে রাস্তায় বের হলে সেসব সুবিধার কোনোটি থেকেই সে বকিত হয় না।

বেলা একটার দিকে রাস্তার পাশে ম্যাকডোনাল্ডসে আমরা দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। কনক পথে একবার গ্যাস নিল এবং কফি কিনল। কখন যে ডালাসে পৌছে গেছি তা খেয়াল করিনি। কনক বলতে লক্ষ্য করলাম দূরে ডালাসের ডাউনটাউনের সুট্চ দালানগুলোর চূড়া দেখা যাচ্ছে। যতই এগোছিছ ততই মনে হচ্ছে এগুলো সব আমার চেনা। সে এক অন্য ধরনের অনুভূতি, অন্য ধরনের আনন্দ।

ডালাসে ফ্লাইওভারের সংখ্যা অনেক। প্রশস্ত রাস্তাগুলো বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভারের ভেতর দিয়ে প্যাং খেয়ে বের হয়ে এমনভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমার কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। কনক যে কিভাবে রাস্তা চিনে বের হয়ে যাচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আমার অবাকই লাগছিল। কনক বলতে বুঝলাম এখানে কেউ আগে থেকে রাস্তা চিনে আসে না। রাস্তার পাশে বা ওপরে ঝুলানো অবস্থায় কিছুদূর পর পর যে সাইনবোর্ডগুলো আছে সেগুলোই পথচারীদের বা মোটর আরোহীদের রাস্তা চিনিয়ে গম্ভীরে পৌছে দেয়। এটা অভ্যাসের ব্যাপার অল্লদিনেই আয়তে এসে যায়। রাস্তাগুলো এত সুন্দর ও মসৃণ যে গাড়িতে চলার সময় কোনোরকম ঝাঁকুনি লাগে না। এখানকার রাস্তাগুলোও যেন দেখার মত। ডাউনটাউন পার হয়ে অনেকদূর আসার পর আমরা একদম ঝাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। কিছুদূর পর পর কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা মাঠ চোখে পড়েছে। বোঝা যায় এসব মাঠ সম্ভবত কেনো না কোনো র্যাঙ্কের অংশ। এরপর ম্যাপ দেখে খুঁজে বের করা হল সেই বিখ্যাত সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ। র্যাঙ্কের কাছে এসে আমি বললাম চল এবার ফেরা যাক। কনক অবাক হয়ে বলল, কেন ভেতরে চুকবে না? আমি তার চেয়েও অবাক হয়ে বললাম অনুমতি ছাড়া অন্যের এলাকায় চুকতে দেবে? তারপর কনক যা বলল তাতে বুঝলাম যে ডালাস টিভি সিরিয়ালটি তৈরি শেষ হবার পর 'সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ' এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্যারিস্ট স্পট। এখানে ডলার দিয়ে টিকেট কেটে ভেতরে চুকতে হয়। পরে অবশ্য আরো জেনেছি, কিছু কিছু দেখেওছি যে আমেরিকায় এরকম হাজারো ট্যারিস্ট স্পট আছে। এরা ব্যবসা জানে। অতি সাধারণ জিনিসকে এরা অসাধারণ বানিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে হাজার হাজার ডলার উপর্জন করে। আমরা ডান পাশের রাস্তা দিয়ে র্যাঙ্কে চুকে পড়লাম। এটা সেই রাস্তা যেখান দিয়ে জে. আর. বি. গাড়ি চালিয়ে র্যাঙ্কে আসত। একটি বড়ো বাড়ির সামনে এসে গাড়ি পার্ক করা হল। বাড়িটির মাথায় বড়ো বড়ো করে লেখা South Fork Ranch. কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে চুকলাম। বিভিন্ন স্থানের দিয়ে সাজানো প্রশস্ত হল ঘর, ছোটো ছোটো মনোযোগ থেকে শুরু করে টেক্সাসের কাউবয়দের পোশাক, রকিং চেয়ার, এমন কি খাট পর্যন্ত সাজানো আছে বিক্রির জন্য। সুন্দর সুন্দর গহনা ব্যাগ জুতো সবই আছে। নাহিন আমাকে সাউথ ফর্ক র্যাঞ্চ লেখা মনোযোগ আর কয়েকটি সুন্দর বলপেন কিনে দিল। এসব জায়গায় বেড়াতে এলে সকলেই কিছু না কিছু কেনে তাই জিনিসের দামও একটু বেশি থাকে। এ হলঘরটি পেরিয়ে একটি করিডোর

দিয়ে পেছনের আরেকটি রুমে গেলাম। সেটা একটি মিউজিয়াম। এখানে রাখা আছে ডালাস সিরিয়ালটির সঙ্গে যুক্ত সব জিনিসপত্র যেমন সৃষ্টিতের সময় ব্যবহৃত চেয়ার টেবিল, লুসি উইয়িং এর বিয়ের পোশাক, এতে সকল অভিনেতার বড়ো বড়ো বাঁধানো পোষাক ইত্যাদি। মিউজিয়ামের মধ্যে সিরিয়ালটির টাইটেল মিউজিক নন স্টপ বেজে চলেছে। মিউজিয়াম দেখলে এবং আশেপাশের পরিবেশ দেখলে সিরিয়ালটির অনেক সূতি ভেসে আসে। মিউজিয়াম দেখা শেষ করে পেছনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াম। এখানে অপেক্ষমান খোলা একটি লম্বা ট্রিলিতে এসে সবাই বসলাম। ঠিক বিকেল সাড়ে চারটায় আমাদের টিকিট ঢেক করা হল। সামনেই দেখলাম ইউয়িং পরিবারের সেই চেনা বাড়িটি। সেই সুইমিং পুল, সেই সুন্দর আগিনা। কিন্তু সব কিছু কেমন ছোটো ছোটো লাগছে। এমন কি জে. আর. এর ব্যবহৃত বেডরুম আর বাথরুমটা কনকদের বেডরুম আর বাথরুমের সমানই লাগল। গাইড ব্যাখ্যা করে বলল যে, শুটিংয়ের সময় বড়ো আয়না ব্যবহার করে সুইমিং পুল থেকে শুরু করে সব কিছুকে বড়ো দেখানো হয়েছে।

এখনে ঘন্টাখানেক ঘুরে ফিরে তারপর সালামতদের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে ইন্দোপাক নামে একটি বড়ো দোকানে চুক্লাম কিছু কেনাকাটা করার জন্য। দোকানটির নাম ইন্দোপাক হলেও এর মালিক নাকি বাংলাদেশী। এখানে কনকের একজন বন্ধু কঢ়ি আর ওর বউ তামেলদার সঙ্গে দেখে ওরা পরদিন রাতে ওদের বাসায় দাওয়াত করল। অষ্টিনে দেখেছি, ডালাসেও দেখলাম এখানকার ভারতীয় পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী দোকানগুলোতে প্রতিদিন ভালো সিঙাড়া, সয়চা ও পেঁয়াজু পাওয়া যায়। নাহিদ শপিংয়ে এলে সিঙাড়া, সয়চা, পেঁয়াজু কিনবেই। ডালাসে বেশ কয়েকটি ইন্ডিয়ান দোকান দেখলাম। এখানে সুন্দর সুন্দর ইন্ডিয়ান শাড়ী ব্লাউজ মেয়েদের হ্রী পিস চুড়ি মালা সব পাওয়া যায়। হাইওয়ের পাশে এরকম একটি ইন্ডিয়ান দোকানে নাহিদ শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ কেনার জন্য চুক্লে, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে রাস্তার গাড়ি চলাচল দেখছি। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে ঠিক বোঝা যায় না গাড়ি কত জোরে চলছে। গাড়ির শুমগুম শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন জেট প্লেন চলছে। সব গাড়িকে সমান তালে চলতে হচ্ছে। ইচ্ছে করে কেউ যে আন্তে গাড়ি চালাবে তার উপায় নেই। সবাইকে একই নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমার মনে হয় এখানে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাওয়া যেটুকু কঠিন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন সব নিয়ম মেনে রাস্তায় গাড়ি চালানো।

সক্যার পর সালামতদের বাসায় এসে পৌছালাম। নীপা আমাদের জন্য বাসার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সালামত সঙ্গাহ দুয়েকের জন্য দেশে বেড়াতে গেছে। নীপাকে অনেক দিন পর দেখে তাকে আমি জড়িয়ে ধরতে যেতেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল খালাস্মা আমার সারা গায়ে কেবল রান্নার গন্ধ। এখানে এই একটি অসুবিধা, রান্নার পর সারা বাড়িতে এবং রাঁধুনীর গায়ে রান্নার গন্ধ লেগে থাকে। আমাদের সাবকন্টিনেন্টের লোকেরা তো আবার রান্নায় নানারকম মশলা ব্যবহার করে তার ফলে রান্নার গন্ধ দূর করার জন্য এরা ঘরের দরজা খুলে এক্স্ট্‍রে ফ্যান চালিয়ে দেয়। আর রাঁধুনীও নিজে ভালো করে সাবান দিয়ে গোসল করে ফ্রেস হয়। এমনিতেই এরা সঙ্গাহে একদিন কি দুই দিন রান্না করে। আজ শনিবার ছুটির দিন তবু অফিসে কাজ থাকায় নীপাকে অফিসে যেতে হয়েছিল।

অফিস থেকে বাসায় ফিরে নীপার রান্না করতে দেরী হয়ে গেছে। আমেরিকায় এসে যে জিনিসটি আমাকে খুবই অবাক করেছে, বলতে গেলে কিছুটা লজ্জায়ও ফেলেছে সেটা হল আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উভয়েরই রান্নাবান্না। ছেলেদের কথা বললাম একারণে যে, এখানে স্বামী স্ত্রী দুজনকেই রান্না করতে হয়। যেসব স্ত্রী চাকুরি করে না সংসারে রান্নার দায়িত্ব তারা পালন করলেও স্বামীরাও রান্নায় সমান পারদর্শী। এখানে প্রতি উইক এভে কারো না কারো বাসায় দাওয়াত থাকবেই। কেউ দাওয়াত থেকে ডালাস থেকে অষ্টিনে যাচ্ছে আবার কেউ অষ্টিন থেকে ডালাস বা হিউস্টন যাচ্ছে। যদি দাওয়াত শনিবার হয় তাহলে মাঝ রাতেই বাসায় ফিরে বাকি সময় ঘুম দিয়ে সকালে আবার অফিস করছে। এ বিদেশ বিভুয়ে সকলের আঁচ্ছায় পরিজনতো আর কাছে থাকে না, তাই বন্ধুরাই হয়ে ওঠে নতুন আঁচ্ছায় পরিজন, আপনজন। এখানে বিশেষ কোনো অসুবিধা না থাকলে দাওয়াত কেউ প্রত্যাখ্যান করে না। অবশ্য বেশ কিছু পরিবার আছে যাদের সকলেই আমেরিকায় চলে এসেছে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। কিছু পরিবার আছে যাদের সকল সদস্য একই স্টেটে, এমন কি একই শহরে বসবাস করছে। আবার কিছু পরিবার আছে যাদের সদস্যরা বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে বিভিন্ন স্টেটে ছড়িয়ে থাকলেও প্রায়ই ছুটিতে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যাওয়া আসা করতে তো আর ভিসা লাগে না। এখানে সব ধরনের পরিবার দেখেছি তাদের ভালোমন্দ সুবিধা অসুবিধাগুলো দেখেছি। আমার মনে হয়েছে যে দেশেই থাকি না কেন মা বাবা ভাই বোন সকলেরই একই দেশে থাকা ভালো। কেউ বাংলাদেশে আবার কেউ বিদেশে থাকলে মনে সব সময় এক ধরনের কষ্ট থেকেই যায়। এখানে সবাই ভালো রোজগার করছে আরাম আয়েশের মধ্যেও জীবন যাপন করছে তা ঠিক। কিন্তু দেশের কথা, আঁচ্ছায় স্বজনের কথা মনে উঠলে সকলেই কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। মনে হয় সবার বুকের ভেতর একটি চাপা ব্যথা লুকিয়ে আছে। অনেকে আবার খোলামেলাভাবে বলেই ফেলে দেশে ভালো চাকুরি পেলে বা প্রচুর বিষয় সম্পত্তি থাকলে এখানে এত কষ্ট করতাম না। কষ্ট বলতে কেবল শারীরিক পরিশ্রম বা কষ্ট নয়, মানসিক কষ্টকেও বোঝানো হয়েছে।

সালামতের বাসায় রাতে থেকে পরের দিন নীপাকে সহ রিংকুর বাসায় শেলাম। রিংকুর বড় স্বপ্ন কল্পিটার সাইসে এম. এস. করছে আর রিংকু ডালাসে একটি বড়ো কোম্পানীতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরি করছে। আমাদের জন্য স্বপ্ন অতি সাধারণ খাবার এত অসাধারণ করে রান্না করেছে যে কি বলব সত্যিই ভোলা যায় না। আট দশ রকমের খাবারের মধ্যে অনেকগুলো খাবারের স্বাদ এখনে আমি ভুলতে পারিনি। একদিন নাহিদের বন্ধু সুবীরের বাসায় দাওয়াত ছিল। সুবীরের বড় মিতুও আমার জন্য অনেক রান্না করেছিল। মিতুর রান্নার প্রশংসনা করাতে মিতু বলল, মাসিমা, লজ্জা দেবেন না। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কি তুলনা হয়? আমি বললাম, লজ্জা আমাদেরই পাবার কথা। এই বয়সে এসেও এত পদের রান্না এত সুন্দরভাবে করতে পারি না। এবার দেশে ফিরে আমি শুধু তোমাদের রান্নার গল্পাই করব।

থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দুপুরে খাওয়া দাওয়াত পর আমরা বেড়াতে বের হলাম। লক্ষ্য করলাম রাস্তার দুপাশে কিছু নতুন অস্থায়ী দোকান। কনকদের বাসার কাছেও দুটো দোকান চোখে পড়ল যেগুলো আগে কখনো দেখিনি। নাহিদ বলল এগুলো বাজির দোকান। আজ রাত

কলোরাডো নদীর তীরে

বারোটার পর সবাই বাজি পোড়াবে তাই এসব অস্থায়ী দোকান বসেছে। থার্টি ফার্স্ট নাইটে নানা রকম ঘটনা ঘটে শুনেছি কিছু এরকম কোনো ঘটনার কথা শুনিনি। রাত বারোটায় আমি বাসায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশে নানা রঙের বাজি খেলা দেখলাম। কনক নাহিদ ঘরে বসে টিভি দেখছিল, তাদের কাছে বাজি পোড়ানোর দৃশ্য নতুন নয়, তাদের দেখার আগ্রহ ছিল না, অত্তপক্ষে আমার মত ছিল না।

নাহিদ বুয়েট থেকে সিলিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েশন করে এসেছিল। সে এখন সাউথ ওয়েষ্ট টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সাইন্সে এম. এস. করছে। আজ শনিবার, সামনের সোমবার থেকে কনকের অফিস খুলে যাবে। আজ সবাই মিলে নাহিদের ইউনিভার্সিটি বেড়াতে গেলাম। ইউনিভার্সিটি সান মার্কোসে অবস্থিত। এখানেই মূল ইউনিভার্সিটির ঠিকানা তবে নাহিদের ক্লাস এখানে হয় না। কনকদের বাসার কাছেই পাঁচ মিনিটের পথ, একটি হাই স্কুলে নাহিদের অন্তর্ভুক্ত ক্লাস হয় আর ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ফ্যাকুল্টির প্রফেসরবাই এখানে ক্লাস নেয়। এম. এস. এর স্টুডেন্টোরা বেশিরভাগই চাকুরিজীবী কিংবা হাউসওয়াইফ তাই ক্লাসগুলো বিকেল পাঁচটায়, স্কুল যখন ছুটি হয় তারপর শুরু হয়। আমরা সান মার্কোসে মূল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস দেখতে গেলাম। ছুটির দিন, তাই লোকজন খুব কম। সুন্দর সুন্দর সব বিভিন্ন, একটি লেকের ওপর ত্রিজ দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপারে গেলাম। শুনলাম এটা লেক নয়, নাকি একটি নদী, নদীর কথা শুনে এবং নদীর অবস্থা দেখে সত্যি বলতে কি আমার হাসিই পেল। এটা নদী, আমার অবাক হওয়া দেখে কনক বলল, এখানে পদ্মা মেঘনা যমুনা খুঁজতে যেয়ো না তাহলে হতাশ হতে হবে। খুব সুন্দর বাতাস বইছিল। হেঁটে হেঁটে সব এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। উচু নীচু রাস্তা, ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে। একটি উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আশে পাশে দেখছি, দূরে রাস্তা দিয়ে দুটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে আসছে। দুজনেরই একই রকমের পোশাক, সাদা ফুল হাতা শাট, কালো প্যাট্র, একই রকমের টাই পরা, পায়ে সুন্দর চকচকে কালো জুতো, মাথায় চুল সুন্দরভাবে ব্যাক ব্রাশ করে আঁচড়ানো। ওরা সাইকেল চালিয়ে আমাদের পাশ দিয়েই চলে গেল। কনক জানাল, এরা এখানকার স্টুডেন্ট তবে পড়াশুনার সঙ্গে ধর্মপ্রচার করে বেড়ায়। অঠিনে যেখানে নাহিদের ক্লাস হয় তাদের দুজনকেই পরে আরেক দিন সেই হাই স্কুলের পাশ দিয়ে একইভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছিলাম। আমেরিকার একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিভন বি জনসন এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশুন করেছে। শুনলাম, লিভন বি জনসনের নামে এই ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর নামকরণ করা যায় কিনা তা নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে সোজা চলে এলাম আউটলেট মলে। শহর থেকে দূরে বলে এ মলগুলোকে বলা হয় আউটলেট মল। বেশ বড়ো এলাকা জুড়ে এই শপিং সেন্টার। শত শত দোকান। এখানে সব দোকান ঘুরে কেনাকাটা করতে গেলে সারাদিন পার হয়ে যায়। বেলা বারোটার দিকে আমাদের নাময়ে দিয়ে পারিসাকে সঙ্গে নিয়ে কনক বাসায় চলে গেল। আউটলেট মলটি অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ওখান থেকে ওদের নিজের বাসে করে দোকানগুলোর সামনে এসে নামলাম। বাসে কোনো ভাড়া নিল না, এরকমই ব্যবস্থা। এখানে প্রতিটি দোকানে সেলে জিনিস বিক্রি হয় সেকারণে সব সময়ই প্রচুর লোকজন কেনাকাটা করতে আসে। টুকটক কিছু কেনাকাটা আমরা করলাম কিন্তু তার চেয়েও বেশ ঘুরে দেখলাম সব কিছু। নাহিদের চেনা জায়গা তাই অল্প

কলোরাডো নদীর তীরে

সময়েই সব কিছু ভালোমত দেখে নেয়া সত্ত্ব হল। কিন্তু আমি একেবারে নতুন এবং প্রথম বলে কোন দিক দিয়ে মলে চুকলাম এবং কোন দিক দিয়ে বের হলাম কিছুই মনে রাখতে পারছিলাম না। এত দোকান যে শেষের দিকে প্রয়োজন না থাকলে কোনো দোকানে চুকিনি। দুপুরে আমরা দুজনে একটি রেস্টুরেন্ট যেয়ে ভেজিটেবল পিজা কিনে খেলাম। রাত আটটার দিকে কনককে ফোন করে জানিয়ে দেয়া হল যে আমাদের কেনাকাটা প্রায় শেষ। বাসা থেকে এখানে আসতে এক ঘন্টার ড্রাইভ তাই ঠিক নয়টার সময় আমরা আগে থেকে নির্দিষ্ট করা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সামনের কফি শপ থেকে গরম কফি কিনে নিলাম। সব সময় লক্ষ্য করেছি হট চকোলেট বা কফি কিনতে গেলেই হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দেবার সময় বলবে, খুব গরম একটু পরে খাও।

এখানকার বড়ো বড়ো মলগুলোতে শনি রবি এই দুই দিন বিভিন্ন খাবার কোম্পানীগুলো তাদের তৈরি নতুন নতুন খাবারের স্যাম্পল বিনা পয়সায় টেস্ট করতে দেয়। যেদিন তিনি চারটি কোম্পানী স্যাম্পল বিলি করে সেদিন খাওয়াটা ভালোই হয়। এছাড়া বড়ো বড়ো মলগুলোতে সব সময়েই ফ্রি কফি পাওয়া যায়। যে যার মত গ্লাসে কফি ঢেলে নিয়ে আরাম করে কেনাকাটা করে। কেনাকাটার ব্যাপারে আর একটি নিয়ম চালু আছে যেটা ক্রেতাদের জন্য খুব সহায় করে। যেমন যে কোনো জিনিস কেনার তিনি মাসের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিয়ে মূল্য রিটার্ন নেয়া যায়। অনেকেই দেখা যায় হ্যাত ইচ্ছে করেই, বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস কয়েক দিন ব্যবহার করে আবার দোকানে ফেরত দিয়ে আসে, আমেরিকান বা বিদেশী বলে কথা নেই।

শপিংয়ে গেলে নাহিদ আর আমি কেনাকাটা করতাম, কনক পারিসাকে ট্রলিতে বসিয়ে সারা মলে চক্র দিত। আমরা এটা ওটা নিয়ে ট্রলিতে রাখতাম। আমি একটি বড়ি লোশন নিয়ে ট্রলিতে রাখতে গেলাম। কনককা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার সামনে একটি মেয়ে ইমিটেশনের গহনা পসন্দ করছিল। কনক বলাতে খেয়াল করে দেখলাম মেয়েটি নীচের ঠোঁট ছিদ্র করে রিং পরে আছে। মেয়েটি দেখতে বেশ মিষ্টি কিন্তু ঠোঁট ছিদ্র করে রিং পরার কারণে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অত্ত আমার কাছে মনে হল না। যখন আমি প্রথম শ্রীগীতে পড়ি তখন কান ফুটিয়েছিলাম, মনে পড়ে। এখনো মনে হলে কানে ব্যথা পাওয়া বলে অনুভব করি। আজকাল দেখি কানে একটির জায়গায় পাঁচটি ছিদ্র করে মেয়েরা, সকলে নয় কেউ কেউ, বরং এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে এসে দেখলাম ঠোঁট ছিদ্র করে গহনা পরার জন্য, সাজাগোজের উদ্দেশ্যে। আরো শুনলাম দুচোখে ক্রু নীচে ছিদ্র করেও নাকি রিং পরে, নাকি নাভিতেও ছিদ্র করে রিং পরে অনেকে। নাভি খুব সেনসিটিভ জায়গা, এখানে ছিদ্র করলে যে কোনো মুহূর্তে বিপদও হতে পারে। বিপদ হয়েছেও অনেকের, তারপরেও নাভি ছিদ্র করে রিং পরার চল থেমে যায়নি। বর্বরতা আর কাকে বলে! আদিম মানুষের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়?

শপিং মলগুলোর বিভিন্ন কর্ণার থাকে, চিল্ডেন কর্ণার, লেডিজ কর্ণার, বয়েজ কর্ণার আরো অনেক। বিভিন্ন কর্ণার থাকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করা থাকে, নিউবৰ্ন বেবী, পাঁচ থেকে সাত বছরের, আট থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য ইত্যাদি। এভাবে ভাগ করে রাখার কারণে সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে নেয়া যায়। একদিন ওয়াল মার্ট মলয়ে শপিংয়ে গেছি, বিভিন্ন কর্ণার ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সব সময় তো আর কেনাকাটা করতে আসি না, কখনো কখনো এমনিতেও ঘুরতে আসি। এক কর্ণারে এসে কিছু জিনিস দেখলাম, এগুলো

বারোটার পর সবাই বাজি পোড়াবে তাই এসব অস্থায়ী দোকান বসেছে। থার্টি ফার্স্ট নাইটে নানা রকম ঘটনা ঘটে শুনেছি কিন্তু এরকম কোনো ঘটনার কথা শুনিনি। রাত বারোটায় আমি বাসায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশে নানা রঙের বাজি খেলা দেখলাম। কনক নাহিদ ঘরে বসে টিভি দেখছিল, তাদের কাছে বাজি পোড়ানোর দৃশ্য নতুন নয়, তাদের দেখার আগ্রহ ছিল না, অন্ততপক্ষে আমার মত ছিল না।

নাহিদ বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েশন করে এসেছিল। সে এখন সাউথ ওয়েষ্ট টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কল্পিটার সাইন্সে এম. এস. করছে। আজ শনিবার, সামনের সোমবার থেকে কনকের অফিস খুলে যাবে। আজ সবাই মিলে নাহিদের ইউনিভার্সিটিতে বেড়াতে গেলাম। ইউনিভার্সিটি সান মার্কোসে অবস্থিত। এখানেই মূল ইউনিভার্সিটির ঠিকানা তবে নাহিদের ক্লাস এখানে হয় না। কনকদের বাসার কাছেই পাঁচ মিনিটের পথ, একটি হাই স্কুলে নাহিদের অন্তর্বর্তী ক্লাস হয় আর ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির প্রফেসররাই এখানে ক্লাস নেয়। এম. এস. এর স্টুডেন্টরা বেশিরভাগই চাকুরিজীবী কিংবা হাউসওয়াইফ তাই ক্লাসগুলো বিকেল পাঁচটায়, স্কুল যখন ছুটি হয় তারপর শুরু হয়। আমরা সান মার্কোসে মূল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস দেখতে গেলাম। ছুটির দিন, তাই লোকজন খুব কম। সুন্দর সুন্দর সব বিস্তৃৎ, একটি লেকের ওপর ব্রিজ দিয়ে হেঁটে এপার থেকে ওপারে গেলাম। শুনলাম এটা লেক নয়, নাকি একটি নদী, নদীর কথা শনে এবং নদীর অবস্থা দেখে সত্যি বলতে কি আমার হাসিই পেল। এটা নদী, আমার অবাক হওয়া দেখে কনক বলল, এখানে পান্না মেঘনা ঘনুমা খুঁজতে যেয়ো না তাহলে হতাশ হতে হবে। খুব সুন্দর বাতাস বইছিল। হেঁটে হেঁটে সব এলাকাটা ঘুরে দেখলাম। উচু নীচু রাস্তা, ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগছে। একটি উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আশে পাশে দেখছি, দূরে রাস্তা দিয়ে দুটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে আসছে। দুজনেরই একই রকমের পোশাক, সাদা ফুল হাতা শার্ট, কালো প্যান্ট, একই রকমের টাই পরা, পায়ে সুন্দর চকচকে কালো জুতো, মাথায় চুল সুন্দরভাবে ব্যাক ব্রাশ করে আঁচড়ানো। ওরা সাইকেল চালিয়ে আমাদের পাশ দিয়েই চলে গেল। কনক জানাল, এরা এখানকার স্টুডেন্ট তবে পড়ালুনার সঙ্গে ধর্মপ্রচার করে বেড়ায়। অস্তিনে যেখানে নাহিদের ক্লাস হয় তাদের দুজনকেই পরে আরেক দিন সেই হাই স্কুলের পাশ দিয়ে একইভাবে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছিলাম। আমেরিকার একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিভন বি জনসন এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়ালুন করেছে। শুনলাম, লিভন বি জনসনের নামে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর নামকরণ করা যাব কিনা তা নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে সোজা চলে এলাম আউটলেট মলে। শহর থেকে দূরে বলে এ মলগুলোকে বলা হয় আউটলেট মল। বেশ বড়ো এলাকা জুড়ে এই শপিং সেন্টার। শত শত দোকান। এখানে সব দোকান ঘুরে কেনাকাটা করতে গেলে সারাদিন পার হয়ে যায়। বেলা বারোটার দিকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে পারিসাকে সঙ্গে নিয়ে কনক বাসায় চলে গেল। আউটলেট মলটি অনেক বড়ো এলাকা জুড়ে। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ওখান থেকে ওদের নিজস্ব বাসে করে দোকানগুলোর সামনে এসে নামলাম। বাসে কোনো ভাড়া নিল না, এরকমই ব্যবস্থা। এখানে প্রতিটি দোকানে সেলে জিনিস বিক্রি হয় সেকারণে সব সময়ই প্রচুর লোকজন কেনাকাটা করতে আসে। টুকটাক কিছু কেনাকাটা আমরা করলাম কিন্তু তার চেয়েও বেশি ঘুরে ঘুরে দেখলাম সব কিছু। নাহিদের চেনা জায়গা তাই অল্প

সময়েই সব কিছু তালোমত দেখে নেয়া সত্ত্ব হল। কিন্তু আমি একেবারে নতুন এবং প্রথম বলে কোন দিক দিয়ে মলে চুকলাম এবং কোন দিক দিয়ে বের হলাম কিছুই মনে রাখতে পারছিলাম না। এত দোকান যে শেষের দিকে প্রয়োজন না থাকলে কোনো দোকানে চুকিনি। দুপুরে আমরা দুজনে একটি রেস্টুরেন্টে যেয়ে ভেজিটেবল পিজা কিনে খেলাম। রাত আটটার দিকে কনককে ফোন করে জিনিয়ে দেয়া হল যে আমাদের কেনাকাটা প্রায় শেষ। বাসা থেকে এখানে আসতে এক ঘণ্টার ড্রাইভ তাই ঠিক নয়টার সময় আমরা আগে থেকে নির্দিষ্ট করা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সামনের কফি শপ থেকে গরম কফি কিনে নিলাম। সব সময় লক্ষ্য করেছি হট চকোলেট বা কফি কিনতে গেলেই হাতে প্লাস্টা ধরিয়ে দেবার সময় বলবে, খুব গরম একটু পরে খাও।

এখনকার বড়ো বড়ো মলগুলোতে শনি রবি এই দুই দিন বিভিন্ন খাবার কোম্পানীগুলো তাদের তৈরি নতুন নতুন খাবারের স্যুপ্লি বিনা পয়সায় টেস্ট করতে দেয়। যেদিন তিনি চারটি কোম্পানী স্যুপ্লি বিলি করে সেন্দিন খাওয়াটা ভালোই হয়। এছাড়া বড়ো বড়ো মলগুলোতে সব সময়েই ফ্রি কফি পাওয়া যায়। যে যার মত গ্লাসে কফি ঢেলে নিয়ে আরাম করে কেনাকাটা করে। কেনাকাটার ব্যাপারে আর একটি নিয়ম চালু আছে যেটা ক্রেতাদের জন্য খুব সহায়ক হয়। যেমন যে কোনো জিনিস কেনার তিনি মাসের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিয়ে মূল্য রিটার্ণ নেয়া যায়। অনেকেই দেখা যায় হ্যাত ইচ্ছে করেই, বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস কয়েক দিন ব্যবহার করে আবার দোকানে ফেরত দিয়ে আসে, আমেরিকান বা বিদেশী বলে কথা নেই।

শপিংয়ে গেলে নাহিদ আর আমি কেনাকাটা করতাম, কনক পারিসাকে ট্রলিতে বসিয়ে সারা মলে চক্র দিত। আমরা এটা ওটা নিয়ে ট্রলিতে রাখতাম। আমি একটি বড় লোশন নিয়ে ট্রলিতে রাখতে গেলাম। কনকরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার সামনে একটি মেয়ে ইঞ্জিনিয়ের গহনা পসন্দ করছিল। কনক বলাতে খেয়াল করে দেখলাম মেয়েটি নীচের ঠোঁট ছিদ্র করে রিং পরে আছে। মেয়েটি দেখতে বেশ মিষ্টি কিন্তু কিছু ঠোঁট ছিদ্র করে রিং পরার কারণে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অন্তত আমার কাছে মনে হল না। যখন আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন কান ফুটিয়েছিলাম, মনে পড়ে। এখনো মনে হলে কানে ব্যথা পাচ্ছি বলে অনুভব করি। আজকাল দেখি কানে একটির জায়গায় পাঁচটি ছিদ্র করে মেয়েরা, সকলে নয় কেউ কেউ, বরং এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে এসে দেখলাম ঠোঁট ছিদ্র করে গহনা পরার জন্য, সাজাগোজের উদ্দেশ্যে। আরো শুনলাম দুচোখে ক্রুর নীচে ছিদ্র করেও নাকি রিং পরে, নাকি নাভিতেও ছিদ্র করে রিং পরে অনেকে। নাভি খুব সেনসিটিভ জায়গা, এখানে ছিদ্র করলে যে কোনো মুরুর্তে বিপদও হতে পারে। বিপদ হয়েছেও অনেকের, তারপরেও নাভি ছিদ্র করে রিং পরার চল থেমে যায়নি। বর্বরতা আর কাকে বলে! আদিম মানুষের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়?

শপিং মলগুলোর বিভিন্ন কর্ণার থাকে, চিল্ডেন কর্ণার, লেডিজ কর্ণার, বয়েজ কর্ণার আরো অনেক। বিভিন্ন কর্ণার বয়স অনুযায়ী ভাগ করা থাকে, নিউবৰ্ণ বেবী, পাঁচ থেকে সাত বছরের, আট থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য ইত্যাদি। এভাবে ভাগ করে রাখার কারণে সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে নেয়া যায়। একদিন ওয়াল মার্ট মলয়ে শপিংয়ে গেছি, বিভিন্ন কর্ণার ঘুরে ঘুরে দেখছি। সব সময় তো আর কেনাকাটা করতে আসি না, কখনো কখনো এমনিতেও ঘুরতে আসি। এক কর্ণারে এসে কিছু জিনিস দেখলাম, এগুলো

কি কারণে ব্যবহার করা হয় তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। নাহিদ বলল এটা পেট কর্ণার। একটি বড়ো পলিথিন ব্যাগ ভর্তি কাঠের কুঁচি দেখলাম। এগুলো কুকুরের ঘরে বিছিয়ে দেয়া হয় কুকুরের আরাম করে শোবার জন্য। কুকুর বেড়ালের জন্য নানা ধরনের বিস্কুট, বিভিন্ন ডিজাইনের খাবারের পাত্র। একটি কাঠের স্ট্রাকচার দেখলাম যেটার গায়ে বিভিন্ন ধরনের ফাঁক ফোকর আছে। এটা ঘরের যে কোনো জায়গায় রেখে দেয়া যায় আর কুকুর লাফ বাপ মেরে এর সাহায্যে খেলতে পারে। কুকুরের খেলাও হয় আবার ব্যায়ামও হয়। সুন্দর সুন্দর কার্পেটও দেখলাম, কুকুরের জন্য স্পেশালভাবে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। স্পেশাল শ্যাম্পু, সাবান, লোশন, অস্তুত সব ব্যবস্থা, এগুলো কুকুরের জন্যই। মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের নেড়ি কুতাঙ্গলোর কথা। মানুষের লাখি বাটা খেয়ে খাঁক খাঁক করে ঘূরে বেড়াচ্ছে। আরো একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশে যখন ডগ ক্ষোয়াড় তৈরি হল সে সময়ের কথা। বিদেশ থেকে নিয়ে আসা স্পেশাল কুকুর দিয়ে গঠন করা হয়েছে এ ডগ ক্ষোয়াড়। খবরের কাগজে বড়ো বড়ো করে ছাপা হল ডগ ক্ষোয়াডের খবর আর ছবি। কী ম্যাজিস্টিক চেহারার সব কুকুর, বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এগুলো আনতে। এগুলোর জন্য চলমান বাজেটও অনেক বড়ো। এসব কুকুরের র্যাঙ্ক আছে আর র্যাঙ্ক অনুযায়ী আছে সেভাবে বরান্দ, টাকা আর এদের সেবায় নিয়োজিত কর্মচারী দুটোই। সে এক এলাহী ব্যাপার, সব কিছুই চোখ ধীরাঁনো। এদের ব্যায়াম করানোর জন্য প্রায়ই মিরপুর টেলিয়ামের বাইরে যে বিশাল মাঠ আছে সেখানে নিয়ে আসা হয়। এভাবে যথারীতি আসার এক দিনের কথা। রুটিন ব্যায়ামের অংশ হিসাবে একদিন সকালে কুকুরগুলো এল। একে একে ডগ অফিসারাও পিক আপ থেকে নেমে এল। প্রথেক ডগ অফিসারের গলার চেইন সমীক্ষ করে ধরে আছে একেক জন মানুষ ট্রেইনার। হাঁৎ মিরপুরের হানীয় একটি নেড়ি কুতাঙ্গ চোখে পড়ল দৃশ্যটা। কিছুক্ষণ সময় নিল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে। তারপর ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের যত নেড়ি কুতাঙ্গ ছুটো এল। প্রথমে প্রতিবাদের ঘেউ ঘেউ রব, তারপর আক্রমণ। ডগ অফিসারগুলো সাহস হারিয়ে ফেলে দিশেহারা, কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। গলার চেইন ধরে থাকা ট্রেইনারদের অবস্থা বেসামাল, দেশীয় নেড়ি কুতাঙ্গলো নিষেধ মানে না, কথা শুনতে চায় না। অনেক কষ্টে কিছুক্ষণ পর অবস্থা কিছুটা বাগে এনে ট্রেইনাররা ডগ অফিসারদের পিক আপে উঠিয়ে নিল। এরপর দে চপ্ট। জয় হল নেড়ি কুতাঙ্গদের। পরের দিন খবরের কাগজগুলোতে প্রথম পাতায় বড়ো করে খবর বের হল নেড়ি কুতাঙ্গের বীরত্বের কিসিসা নিয়ে। কথাগুলো নতুন করে স্থৃতিতে এল, আমি মনে মনে বললাম, নেড়ি কুতাঙ্গ অফ মাই কান্ট্রি, মাই হ্যাটস অফ টু ইউ, তোমাদের সাহসের জন্য ধন্যবাদ।

আমি বরাবর একটি অভিযোগ করেছি যে এখানকার বাড়িগুলির সবই এক রকমের দেখতে। বাইরে থেকে মনোটনাস বা একমেয়ে মনে হয়, কোনো বৈচিত্র্য নেই। এখানে হোমলেস আছে তবে আমেরিকা বড়োলোকদের দেশ। এদের বাড়িগুলির দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবার কথা, আমার চোখের অবস্থা সেরকম কিছু হল না। আমরা দরিদ্র দেশের মানুষ তারপরেও ধানমতি গুলশান বারিধারা এলাকায় কত সুন্দর বাড়ি হয়েছে। এখানে একটি বাড়ির ডিজাইনের সঙ্গে অন্যটি মিলে না। সবগুলোরই স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। লক্ষন প্রবাসী সিলেটোরাও নিজ শহর সিলেটো কর্ত চমৎকার সব ডিজাইনের বাড়ি বানিয়েছে। কনক

একদিন বলল, আম্মা চল আজ তোমাকে বিভিন্ন ডিজাইনের বড়োলোকদের বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে আসি। একদিন দেখতে চললাম। সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা ধরে কনক গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। মস্ত চওড়া রাস্তা, এঁকেবেঁকে কখনো দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ওপরে উঠে গেছে আবার কখনো নীচে নেমে গেছে। কোথাও কোথাও রাস্তা এমন খাড়াভাবে ওপরে উঠেছে যে সত্যি বলতে কি আমার খুব ভয় করছিল। এর ভেতর দিয়েই সকল গাড়ি খুব দ্রুতগতিতে যাওয়া আসা করছিল। এক পর্যায়ে এসে পৌছলাম বড়োলোকদের আবাসিক এলাকার মধ্যে। বেশ ফাঁকে ফাঁকে বড়ো এলাকা জুড়ে একেকটি বাড়ি। বাড়ির সামনে খোলা লন। সকল বাড়িতেই দুর্যোগটি বড়ো বড়ো গাছ আছে এবং সেসব গাছের কোনো একটিতে আবার ত্রি হাউসও আছে। আসলেই সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি। বাড়ির ছাদগুলো এক রকমের হলেও এসবের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অক্রতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন। কোনো বাড়ি পাহাড়ের ওপরে, কোনোটি আবার সমতল জায়গায়। বেশির ভাগ বাড়িই পাহাড়ের ওপর। এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে গেলাম। এখানেও অপূর্ব সুন্দর সব বাড়ি। একটি বাড়ির সামনে দেখলাম সবুজ চতুরে সাত আটটি হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। হরিণগুলো দেখে অবাক হলাম। ঘৃক্তিই আরো অবাক হলাম একথা জেনে যে এগুলো নাকি পোষা হরিণ নয়। পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে ঘাস খাওয়ার জন্য এবং এভাবে ঘাস খেতে খেতেই এতদূর চলে এসেছে। কী নির্ভয়ে হরিণগুলো ঘূরে বেড়াচ্ছে, আমার বেশ বিস্ময়ই লাগল। মনে পড়ে আমার বাবা খুব ভালো শিকারী ছিলেন। আমার ছোটোবেলায় বাবাকে অনেক হরিণ শিকার করতে দেখেছি, দুটো বাঘও তিনি শিকার করেছিলেন। একটি দিনাজপুরের জঙ্গলে এবং অপরটি চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের জঙ্গলে। আমার বাবা আবদুল কুদুস ভূইয়া ছিলেন ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের প্রথম বাস্রার। উনিশশো আটাব্বা সালে আমরা যখন সপরিবারে ফৌজদারহাট যাই তখনে ক্যাডেট কলেজের কনষ্ট্রাকশনের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। আমাদের বাসার পেছনের পাহাড়টা ছিল গভীর জঙ্গলে মেরা বাবা সেই জঙ্গল থেকেই বাঘ শিকার করেছিলেন। তাছাড়া এ জঙ্গল থেকে বারো হাত লম্বা একটি অজগর সাপও বাবা বন্দুক দিয়ে শিকার করেছিলেন। তখন আমার প্রাথমিক কৈশোর, তবু এসকল শৃতি আমার মনে এখনো গভীরভাবে গেঁথে আছে। আজ এতগুলো মুক্ত বন্য হরিণ দেখে আমার সেই ছোটোবেলার শৃতিগুলো মনে পড়ল। কনক বলল, এখানেও লোকেরা শিকার করে তবে সেজন্য সরকারের অনুমতি নিতে হয়।

দিন শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হল। তাই আজ আর ঘুরলাম না, বাসায় ফিরে এলাম। এখানে আরো কিছু বড়োলোকদের এলাকা আছে, কলোরাডো নদীর তীরেও আছে। সেগুলো আরেক দিন দেখতে গেলাম। কলোরাডো নদীটি অস্টিনের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। আমাদের দেশের বড়ো নদীগুলোর মত চওড়া না হলেও কলোরাডো খুবই দীর্ঘদেহী। আমেরিকার অনেকগুলো চেটের ভেতর দিয়ে এটা বয়ে চলেছে। একটি পাহাড়ের উঠে সেখানে ওপর থেকে অনেক অনেকদূর পর্যন্ত তাকে দেখা যায়। ভালোভাবেই দেখা যায়। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম। ছুটির দিন, তাই দর্শকের সংখ্যাও অনেক বেশি। বুঝলাম, আসলেই এটা দেখবার মত জায়গা তাই এত দর্শকের সমাগম হয়। সুবিধাজনক একটি জায়গায় এসে কলোরাডো নদীকে মন ভরে দেখলাম। খুবই সুন্দর লাগছিল ওপর থেকে। নীল রঙের নদী নিবৃত্ত শান্তভাবে বয়ে চলেছে। এখন

শীতকাল, তাই পানি অনেক কমে গেছে। দুই তীরের শুকনো মাটি বের হয়ে আছে। নদীর দুই তীরে সারিসারি অনেক বাঢ়ি দেখা যাচ্ছে। নদীর একেবারে তীর ঘেষে বাঢ়িগুলো তৈরি করা হয়েছে সেকারণে এগুলো নাকি ডলারের মানে অত্যন্ত মূল্যবান! হয়ত একই স্পেসের বা একোমোডেশনের বাড়ি অন্য এলাকায় এখানকার তুলনায় অনেক কম দামে পাওয়া যাবে। এগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক বাড়িতে গাড়ির গেরেজের মত স্পীডবোটের জন্যও গেরেজ আছে। এখন নদীতে পানি কম সেজন্য নদীর পানি এবং বাঢ়িগুলোর দ্রুত বেড়ে গেছে। বর্ষা মৌসুমে, বৃষ্টির সময় নদীর কুল যখন ছাপিয়ে যাবে তখন এসবের প্রকৃত সৌন্দর্য বোঝা যাবে, বাঢ়িগুলো যে নদীর তীর ঘেষেই তৈরি তা আরো বেশি করে বোঝা যাবে। উচ্চ পাহাড়ের ওপর থেকে আমার কাছে বাঢ়িগুলো ডল হাউসের মত লাগছিল। বামদিকে দূরে ডাউনটাউনের সুউচ বিল্ডিংগুলোর চূড়া দেখা যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে ভাবছিলাম আমাদের দেশের নদ নদীগুলোর কথা। আমি সিরাজগঞ্জের মেয়ে, নদীর ভাঙম কাকে বলে ভালো করেই জানি। একবার বর্ষা মৌসুমে দাদার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে দাদার বাড়ি দুই দুইবার নদীর ভাঙমের শিকার হয়েছে, যমুনার গর্ভে সব কিছু ভেঙে বিলী হয়ে গেছে। দুইবার ডিটামাটি হারানোর পর এখন যেখানে বাড়ি করা হয়েছে যমুনা নদী সেখান থেকে আধা মাইলের মত দূরে। রান্নাঘরের পাশেই কৃয়া। একদিন কৃয়া থেকে পানি তুলতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাতে কৃয়ার গায়ে ঝাকুনি লাগল আর কেমন একটি শব্দ করে পানি ছলকে উঠল। ভয়ে বড়ো চাটীআমাকে ডাক দিলাম। আমার ভয়ার্ত ডাক শুনে চাটীআমা রান্না ঘর থেকে ছুটে এলেন। সব শুনে নির্বিকারভাবে বললেন, ও কিছু না, নদীর পাড় ভাঙছে। যেদিন দাদার বাড়ি থেকে ঢাকায় চলে আসব, লঞ্চ ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। একটি মাত্র ঘাট, চারপাশ ফাঁকা। লঞ্চ আসতে দেরি আছে, সবাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। নদীর পানিতে কী স্নোত! নদীর স্নোতে একটি গাছের গুড়ি ভেসে যাচ্ছে। দুটো ছেলে এ স্নোতের সঙ্গে লড়াই করে সেই গুড়িটিকে পাড়ে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। আমরা কয়েকজন মিলে সেই দৃশ্য দেখছিলাম তীরে দাঁড়িয়ে। হঠাতে কেউ একজন জোরে ডাক দিল মনে হল। ডাক দিয়ে আমাদের আরো পেছনে চলে যেতে বলল। খেয়াল করে দেখি, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পেছন দিয়ে, বেশ খানিকটা জ্বায়গা জুড়ে মাটিতে ফাটল ধরেছে। তাড়াতাড়ি অনেকখানি পেছনে সরে এলাম। মিনিট দশেক পরেই এ ফাটল বরাবর মাটির চাক দড়াম করে নদীর মধ্যে পড়ে গেল। এই শান্ত কলোরাডো নদীর তীরে এখানকার বড়োলোকেরা সৌখিন বাড়ি বানিয়ে কী নিশ্চিতে বসবাস করছে। তবু বলব, শান্ত কলোরাডো, তোমার চেয়ে তেজিস্বী প্রোত্তিস্থি কলহাস্তরিতা যমুনা নদী আমার কাছে সুন্দর, অনেক বেশি সুন্দর। কলোরাডো নদীর তীরে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে বসিয়ে কনক আমার কয়েকটি ছবি তুলল। মনে মনে কৌতুহল হল, দেশে ফিরে ভ্রম কাহিনী প্রকৃতই যদি লিখতে পারি সে বইয়ের নাম দেব কলোরাডো নদীর তীরে। কনক বলে দিল, এখানে তোলা তোমার একটি ছবি দিয়ে তুমি বইয়ের প্রচ্ছদ করতে পারো। যমুনা নদীর শৃঙ্খল, এর কল্পে মনের মধ্যে ভাসছিল, যমুনা এবং কলোরাডোর একটি প্রতিযোগিতাও আমার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। আমি কলোরাডো ছেড়ে যাব কিছু যমুনা আমাকে ছেড়ে যাবে না। কলোরাডো নদীর তীরে আমার লেখার প্রেরণা হয়ে থাকল। সেই সঙ্গে আমার লেখার প্রেরণা হল পারিসা, সে ছিল আমার খেলার সাথী। আমার নাতনী পারিসার স্বপ্নের পৃথিবী তো কলোরাডো নদীর তীরে এবং এখনো একে ঘিরেই।

চার.

কনকের টেলিভিশনে প্রচুর চ্যানেল ধরা যায়। দেখার সুবিধার জন্য কনক চ্যানেলগুলোকে ভাগ ভাগ করে সাজিয়েছে। সব নিউজ চ্যানেল পর পর সাজানো, তারপর বাচ্চাদের সব চ্যানেল এভাবে এন্টারটেইনমেন্ট বাকি সকল চ্যানেল রাখা হয়েছে। এখানকার নিউজ চ্যানেলগুলো আমার কাছে বিবিসি নিউজ চ্যানেলের মত বৈচিত্র্যময় মনে হয়নি। সকল চ্যানেলেই ঘুরে ফিরে সব একই খবর। এই তিন মাসে বহির্বিহৃতের খবর বলতে ইরাক যুদ্ধ আর সাদাম হোসেন প্রসঙ্গ, এর বাইরে খুব একটা খবর শুনিনি। বাচ্চাদের চ্যানেলে কার্টুন ছাড়াও তাদের উপযোগী করে তৈরি সুন্দর সুন্দর সিরিয়াল দেখানো হয়। পারিসার প্রিয় চ্যানেল হল নিক জুনিয়র, এই চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে বুজ বুজ হল পারিসার প্রিয় অনুষ্ঠান। বাচ্চাদের চ্যানেলে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোর শতকরা নববই ভাগই শিক্ষামূলক। এগুলো এত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয় যে বাচ্চারা অনেকটা নিজের অজান্তেই সব কিছু শিখে নিছে। এমন কি এগুলো বড়োদের কাছেও সমানভাবেই প্রিয়। ডোরা দা এক্সপ্রেসোর নামে একটি কার্টুন দেখানো হয়। কিভাবে ম্যাপ দেখে পথ চিনে গুরবে পৌছানো যায় তা এখনে শেখানো হয়। ডোরা নামে একটি বাচ্চা মেয়ে এর প্রধান চরিত্র। ডোরার সহকর্মী হল বুটস নামের একটি বানর। একটি খেকশিয়াল আছে যে নাকি ডোরার যাতাপথে সব সময় বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ডোরা বুটস এর সহযোগিতায় সে বাধা অতিক্রম করে গুরবে পৌছে যায়। ডোরার পিঠে একটি ব্যাগ থাকে এর মধ্যে সব সময় একটি ম্যাপ একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাসসহ কিছু দরকারী জিনিসপত্র থাকে। এগুলো ওর চলার পথে কাজে লাগে। ডোরার এই জনপ্রিয়তা ব্যবসায়ীরা খুবই কাজে লাগিয়েছে। প্রতিটি শপিং মলে বাচ্চাদের কর্ণারে ডোরার ছাপ মারা জিনিসপত্র ছড়াচাঢ়ি। বাচ্চাদের কষ্টলে ডোরা আর বুটস এর ছবি প্রিন্ট করা। ডোরার ব্যাগ ক্যাপ টি শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি সব কিছুই বাচ্চাদের কর্ণারে পাওয়া যাবে। কেবল ডোরা নয় এরকম আরো অনেক জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রের ছাপ মারা জিনিসপত্র বাচ্চাদের কর্ণার দখল করে আছে। বুজ বুজ অনুষ্ঠানে শেখানো হয় কিভাবে ঝুর সাহায্যে জিনিসপত্র খুঁজে বের করা যায়। লিটল বিল কার্টুনে কিভাবে ফ্যামিলি মেম্বার এবং স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা শেখানো হয়। আসলে বাচ্চাদের শেখানোর দায়িত্ব এক্রঞ্চ চ্যানেলগুলোর পালন করার ফলে মা বাবাদের দায়িত্ব এবং কষ্ট একটু কমেও গেছে হয়ত।

বড়োদের টিভি অনুষ্ঠানগুলো অনেকটা আমাদের দেশের মতই। মুভি চ্যানেলে ভালো ভালো ইংরেজি ছবি দেখানো হয়। খুবই সুন্দর কিছু সিরিয়াল ও দেখলাম। এবিসি চ্যানেলে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান দেখলাম, কয়েক সপ্তাহ ধরে। নাম ব্যাচেলরেট। একটি মেয়ে পাঁচশ জন ব্যাচেলর থেকে বাছাই করে শেষ পর্যন্ত একজনকে নিজের জীবনসঙ্গী করার জন্য নির্বাচন করে। প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু ব্যাচেলর বাদ হয়ে যেত। শেষ পাঁচজনের সঙ্গে সে ডেটিং করে। অনেকটা এখানকার ওপেন মার্কেট পলিসির ব্যবসার মত, প্রতিযোগিতার দুনিয়া এভাবেই তো হবে। সপ্তাহে দুইদিন দেখানো হত অনুষ্ঠানটি। একদিন মূল অনুষ্ঠান আরেক দিন এর পুনঃপ্রচার। এটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকটা যেন ক্রীড়া অনুষ্ঠান, ফলাফল দেখার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তবে

আমার কাছে এটা অনেকাংশে বানানো নাটকের মত মনে হয়েছে। এভাবে সত্যিকারের জীবনসঙ্গী বাঁচাই করা যায় না, যে সমাজ ব্যবহৃতেই হোক না কেন একে কৃত্রিম সাজানো মনে হবে। শেষ অনুষ্ঠানে মেয়েটি দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে। পরের দিন নিউজ চ্যানেলে খবর প্রচারিত হল সারা আমেরিকাবাসী নাকি মর্মাহত কারণ মেয়েটির পছন্দ তাদের মনঃপুত হয়নি। মেয়েটির নাম ক্রেস্টা আর ছেলেটির নাম চার্লি। এরপর কয়েকদিন ধরে চলল ওদের দুজনের সাক্ষাৎকার। তারপর প্রচারিত হল মেয়েটি যাদের বাদ দিয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার। সে এক অস্তুত অবস্থা। ইতিমধ্যে ক্রেস্টা যে পাঁচজনের সঙ্গে ভেটিং করেছিল তাদের মধ্যে হতাশাহস্ত একজন ড্রাগস নেবার কারণে ধরা পড়ল।

দেশে সিনেমা হলে বসে সিনেমা দেখি না প্রায় দুই দশক হবে। মনে পড়ে সর্বশেষ যে ছবিটি হলে বসে দেখেছিলাম তা তারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের একত্রে প্রযোজনায় নির্মিত, ছবির নাম দুরদেশ। এরপর সিনেমা এবং সিনেমা হল দুয়েরই অবস্থা দিনকে দিন যা হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে হলে বসে সিনেমা দেখার আগ্রহ কমেই কমে গেছে। দুয়েকটি ভালো ছবি হলে চললেও আমি অপেক্ষা করে থাকি কবে এগুলো টেলিভিশনে দেখাবে। আমেরিকায় আসার পর বেশ কয়েকটি ছবি দেখলাম, বিশেষ করে হ্যারি পটার টু ছবিটি দেখে নতুন করে হলে বসে সিনেমা দেখার আনন্দ উপভোগ করলাম। এখানে হলে হিন্দী সিনেমাও দেখানো হয় তবে একেকটি ছবি দুয়েক দিনের বেশি চলে না। আমার আমেরিকায় যাবার কয়েক দিন আগেই হিন্দী দেববাস ছবিটি দেখানো হয়েছে। এই ছবিটি নাকি তুলনামূলকভাবে বেশি দিন চলেছে। পরে অবশ্য বাসায় বসে টেলিভিশনে দেববাস ছবিটি দেখেছি। দেশে ফেরার দুই দিন আগে এক অর এক গেয়ারা ছবিটি হলে দেখতে গেলাম। বেশির ভাগ দর্শকই ইতিয়ান এবং পাকিস্তানী। একটি কমপ্লেক্সে তিনটি হলে একই সঙ্গে তিনটি ছবি দেখানো হচ্ছে। আমরা যেখানে বসে ছবি দেখলাম সেটা তুলনামূলকভাবে ছোটো হল। সকলেই সপরিবারে এসেছে। ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে সত্ত্বর উর্ধ্ব মহিলাকেও দেখলাম এসেছে। হিন্দী এক অর এক গেয়ারা ছবিটির কাহিনী সাদামাটা হলেও এটা দেখে প্রবাস জীবনে কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করা যায়।

বড়দিন আর নববর্ষের ছুটি শেষ করে অফিসগুলো সব খুলে গেল জানুয়ারি মাসের দুই তারিখে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলল আরো পরে জানুয়ারি মাসের বারো তারিখে, জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিন পার করে দিয়ে।

সেদিন বেশ শীত ছিল, আকাশ মেঝে ঢাকা। আমাকে অবাক করে দিয়ে বৃষ্টি নামল। অঞ্চলে প্রথম বৃষ্টি দেখলাম, আমাদের দেশের বৃষ্টির সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সারা দিন ধরেই বর বর করে বৃষ্টি। আমাদের দেশের মত এখানে রাস্তায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে না। তবে ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে যখন জোরে গাড়ি চলে তখন রাস্তার বৃষ্টির পানি যেটুকু গড়িয়ে যায় তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে এমন শব্দ হয় যেন কত পানি জমে আছে। কথায় বলে খালি কলসী বাজে বেশি। শনিবার দিন বৃষ্টির কারণে বাসা থেকে বের হলাম না। কিন্তু পরের দিন রবিবারও যখন বৃষ্টি বদ্ধ হল না তখন কনক বলল এভাবে ছুটির দিন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। সকাল দুশ্টার দিকেই সান এন্টোনিয়োর উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কনকরা থাকে অস্টিনের উত্তর দিকে সান এন্টোনিয়ো হল দক্ষিণ দিকে।

সেখানে পৌছাতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। ওখান থেকে আরো আশি মাইল দূরে ন্যাচারাল বিজ ক্যার্ভার্জ দেখতে গেলাম। এখানেও টিকেট কেটে ভেতরে চুক্তে হয়। এটা একটি ন্যাচারাল গুহা, সত্ত্বর দশকে আবিস্কৃত হয়। তখন এখানে হাইওয়ে তৈরির কাজ চলছিল। এ প্রয়োজনে যখন ড্রিলিং হচ্ছিল তখন ড্রিলিং মেশিনের অংশ ফাঁকা জায়গায় চুকে পড়লে সকল কাজ বদ্ধ রাখা হয় এবং ফাঁকা জায়গার উৎস খোঝা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে প্রাকৃতিক গুহাটির সঞ্চান মেলে। ঠিক দেড়টার সময় আমাদের গুহার ভেতরে নিয়ে যাবে। এখনো হাতে সময় আছে তাই হলুকমের মধ্যে সাজানো দোকানগুলো ঘুরে ফিরে দেখছি। সুন্দর সুন্দর সুড়ভেনির দিয়ে সাজানো দোকানপাট। সকল টুরিস্ট স্পটেই জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি তবু সবাই কিছু না কিছু কিনেই থাকে। নাহিদ আমার জন্য সুন্দর একটি মনোগ্রাম কিনল আর পারিসার জন্য একটি খেলনা। কনক পারিসাকে নিয়ে বাইরেই থাকল। গাইড মেয়েটি আমাদের বলে দিল যে সম্পূর্ণ গুহাটি ঘুরে দেখতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে। গাইড আমাদের পোশাক সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দিল। বৃষ্টির কারণে দর্শনার্থীর সংখ্যা কম হলেও সব মিলিয়ে আমরা পনেরো জন ছিলাম। নাহিদ শেলোয়ার কামিজ পরেছিল আর আমি পরেছিলাম শাড়ি, বাকি সবাই জিনস। নাহিদ আর আমি বাদে বাকি সবার পায়েই কেডস ছিল, আমাদের পায়ে সামান্য হিল তোলা সেঙ্কেল সু। গাইড পোশাক আর জুতা সম্পর্কে যেভাবে সতর্ক করে দিচ্ছিল তাতে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। নাহিদ আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, এরা সব সময় একটু বেশি করেই বলে যাতে কোনোরকম দায়িত্ব নিতে না হয়। নাহিদ আরো বলল জুতায় যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে হাতে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটবেন। আমি এক হাতে শাড়ি উচ্চ করে অন্য হাতে রেলিং ধরে ধরে হাঁটতে লাগলাম। বৃষ্টির কারণে পথ ভেজা ছিল, তাছাড়া গুহার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় পানি পড়ছিল। প্রথমে একটু ভয় লাগছিল, তারপর গুহার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে এত মুঝ হয়ে গেলাম যে আর মনেই থাকল না আমি কি পোশাক বা কি জুতো পরে এসেছি। সর্বমোট তিনটি গুহা, কোথাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে হয়, আবার কোথাও সম্মানীয় রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। আবার কোথাও এক গুহা থেকে অন্য গুহায় প্রবেশ পথ তৈরি হয়েছে। প্রতিটি গুহা এত বড়ো আর এত সুন্দর কারুকাজ সমৃদ্ধ যে, দেখে মনে হয় রোমান স্থান্ত্রিকের কোন রাজস্বাদে এসেছি। এগুলো প্রাকৃতিকভাবে গঠিত স্ট্যালেগটাইট ও স্ট্যালেগমাইটের কারুকাজ দিয়ে সৃষ্টি। ভেতরেই দুটো জায়গায় বিশাম নেবার জন্য বেঁকি পাতা আছে দেখলাম। প্রাকৃতিকভাবেই দেয়ালের গায়ে নানা রকম নকশা তৈরি হয়ে আছে। গাইড বলল তোমরা নিজেদের ইমাজিনেশন দিয়ে নকশাগুলো দেখ তাহলে আরো বেশি ভালো লাগবে। আসলেই খেয়াল করে দেখলাম দেয়ালের গায়ে বিভিন্ন ইমেজ ফুটে উঠেছে। দর্শকদের মধ্য থেকেই একেক জন একেক রকমের চিত্র আবিষ্কার করে ফেলল। একটি দেয়ালে দেখা গেল যেন একটি বিশাল কুমীর হাঁ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এক জায়গায় সুন্দর একটি মেয়ে চুল পিঠে ছড়িয়ে একটি চিত্রির ওপর মুখটি নীচু করে বসে আছে। অপরূপ সব দৃশ্য, চোখ ফেরালো যায় না। মনে করতে ইচ্ছা হয় এগুলো যেন কোনো বিখ্যাত শিল্পীর নিপুণ হাতের শিল্পকর্ম। এক জায়গায় এসে গাইড হাসতে হাসতে বলল, দেখ দেখ চারদিকে কত ডোনাট ছড়িয়ে আছে, আর এই দেখ কত বড়ো একটি বার্থ ডে কেক। মাটির নীচের অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এক সময় শেষ প্রাপ্তে এসে পৌছালাম। এখানে পানি

খাবার ব্যবহৃত আছে, দর্শকরা প্রায় সকলেই পানি খেল। তারপর লম্বা একটি প্যাসেজ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ানাম। ততক্ষণ চারদিকে রোদ বালমাল করছে। আমেরিকায় আসার সময় প্লেন যখন মেঘের খুব ওপর দিয়ে আসছিল তখন পৃথিবীর ওপরে আকাশের সৌন্দর্য, যেন নতুন সূর্যের আলো গভীর আনন্দে মনের মধ্যে আঁকড়ে ধরেছিলাম, আগেই কিছু বলেছি। আজ ন্যাচারাল শ্রীজ ক্যান্ডেল এসে মাটির নীচে গুড় সৌন্দর্য, নতুন একটি ভুবন চোখের সামনে উত্তোলিত হল। দুটো সৌন্দর্য, দুটো আনন্দ দুরকমের। এক মহান শিল্পীর সৃষ্টি এসকল শিল্পকর্ম দেখে মুন্তায় সে শিল্পীর প্রতি শুন্দাবন্ত হই।

দুপুরে সবাই ম্যাকডোনাল্ডস থেকে বার্গার কিনে খেলাম। কনক আমাকে সব সময় ফিস বার্গার কিনে দেয় কারণ ফিস বার্গারের ক্ষেত্রে হারাম হালালের কোনো প্রশ্ন থাকে না। বিকেলে আবার সান এটেনিয়োতে ফিরে এলাম। আমেরিকার সব জায়গায় বড়ো বড়ো মলগুলোতে থিয়েটার আছে যেখানে সিনেমা দেখানো হয়। আর এসব থিয়েটারে আগে আসলে আগে পাবেন ব্যবহৃত। এখানে টিকেট নম্বর বসানো নেই। যে যার পছন্দমত জায়গায় বসে সিনেমা দেখবে। এরকম একটি থিয়েটারে থ্রি ডাইমেনশন সিনেমা দেখলাম। জীবনে এই প্রথম থ্রি ডাইমেনশন সিনেমা দেখা। এক ধরনের কালো রঙের বিশেষ চশমা পরে এ সিনেমা দেখতে হয়। এই প্রথম বলে সিনেমা দেখার সময় প্রয়োজন হচ্ছিল জিনিসপত্র সবই আমার গায়ে এসে পড়ছে তাই বারবার চমকে উঠছিলাম আর মাথাটা বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। সিনেমা শেষ হবার পর যে পাশ দিয়ে চুকেছিলাম তার বিপরীত পাশ দিয়ে বের হয়ে এলাম। বের হবার সময় দরজার কাছে একটি বড়ো বাস্কেট রাখা আছে সবাই সেটাতে কালো চশমাগুলো খুলে রেখে বের হয়ে এলাম। একই হলে পনেরো মিনিট পরে দেখানো হবে এনিমেশন ফিল্ম, দি লায়ন কিং। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেখানে থায় ছয় ফুট উচ্চ একজন আমেরিকান সৈনিকের মৃত্যি রাখা আছে। এখানেও মেঞ্জিকানদের সঙ্গে আমেরিকানদের বড়ো রকমের একটি যুদ্ধ হচ্ছে, এ মৃত্যি তারই সৃষ্টি ধরণ করে আছে। হাতের শিরাগুলো কপালের ভাঁজ চোখের দৃষ্টি সব কিছু মিলিয়ে মৃত্যুটিকে এত জীবন্ত লাগছে মনে হচ্ছে যে এখনই হয়ত কোনো কথা বলে উঠবে। একটি বাক্তা ছেলে অনেকক্ষণ ধরেই হৈই ইউ, হৈই ইউ বলে ডাকছিল। বাস্টারির আর কি দোষ দেব, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি।

আজ রাতে জেনিফারদের বাসায় দাওয়াত তাই সান এটেনিয়ো থেকে সোজা ইউটি অস্টিন চলে এলাম। জেনিফাররা তিন ভাই বোন, তিনজনেই ইউটি অস্টিনে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস, অস্টিনে পড়ে। ওদের বাবা মা কাতারে থাকে। জেনিফার সবার বড়ো। তার এম.এস. শেষ করতে আর মাস দুয়েক বাকি আছে। তার স্বামী সিঙ্গাপুরে চাকরি করে। তার চার বছরের একটি ছেলে আছে, নাম আয়নান। ওর ছোটো বোন সিনিয়া আন্দুরগাড় এর ছাত্রী। দুই বনের মাঝখানে এক ভাই, নাম সাহেদ। সাহেদ এবার কম্পিউটার সাইসে গ্রাজুয়েশন করল। এম.এস. যে ভর্তি হবে কিন্তু আমেরিকার নতুন নিয়ম অনুযায়ী ওকে দেশে চলে যেতে হবে। তারপর এম.এস. যে ভর্তি হলে দেশ থেকেই নতুন করে ভিসার জন্য দাঁড়াতে হবে। ভিসার পর দুইবার ভিসার জন্য দাঁড়িয়ে দুইবারই ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্যে ছেলেটি নিজেই চাকায় এসে বটকে সঙ্গে নিয়ে ভিসার জন্য দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বটটি এবারও ভিসা পেতে ব্যর্থ হয়েছে, উপরতু আমেরিকান দৃতাবাস নাকি ছেলেটির ভিসাও বাতিল করে দিয়েছে।

কলোরাডো নদীর তীরে

চাকুরি চলে যায় সে ভয়তো আছেই। তার ওপর এক মাসের মধ্যে নতুন চাকুরি জোগাড় করতে না পারলে দেশে ফেরত আসতে হবে। আমি যে সময় পর্যন্ত আমেরিকায় ছিলাম তার মধ্যেই দুটো ছেলে দেশে ফিরে এসেছে।

এখন আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই অনেক বাঙালি বসবাস করছে। যতদূর শুনলাম এদের মধ্যে সর্বাধিক বাংলাদেশী, ভারতীয় বাঙালির সংখ্যা সে তুলনায় কম। তবে অবাঙালি ভারতীয়দের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি। অস্টিনে কনকদের পরিচিত একটি মেয়ের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে প্রায় হাজারখানেক বাঙালি উপস্থিত হয়েছিল। সুদূর বিদেশের মাটিতে এক সঙ্গে এত বাঙালি দেখে মুঠ হয়ে গেলাম, সেই মুহূর্তে আমি বিদেশে আছি বলে ভুলে গেলাম। পরে শুনলাম, ডালাসে নাকি প্রায় ছয় সাত হাজার বাঙালি আছে। একারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশের মাটিতে থেকে দেশীয় কালচার ধরে রাখতে পারছে। কী কথাবার্তায় পোশাক আশাকে, খাওয়া দাওয়ায়, কী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সর্বত্রই নিজেদের আইডেন্টিটি বজায় আছে। মেয়েরা অফিসে শার্ট প্যান্ট পরে গেলেও অফিসের বাইরে সর্বত্রই দেশীয় পোশাক পরতে পদস্থ করে। পোশাকের ক্ষেত্রে একটি অন্তর্ভুক্ত বিষয়ও লক্ষ্য করলাম। দামী কাতান বেনারসীর চেয়ে টাঙাইলের সুতীর শাড়ির প্রতি আগ্রহ বেশি। বাসার সকলেই বাংলায় কথা বলে সেকারণে ছেলে মেয়েরা স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করলেও বাংলা ভাষার চর্চা থেকেই যায়। আমাদের দেশের যেসব ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করছে তাদের ইংরেজি প্রীতি দেখে সত্যি কথা বলতে কি এ মাধ্যমের প্রতিই আমার বিরক্তি এসে গেছে। এসব ছেলেমেয়ে শতকরা নববই ভাগই উঠতে বসতে ইংরেজি ভাষায় কথা না বলে শাস্তি পায় না। এমন কি তাদের পিতা মাতারাও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পদস্থ করেন। ভাবখানা এমন যে, ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা বুঝতে কঠ হবে।

এ বিয়েতে দেশীয় কোনো আচার অনুষ্ঠানই বাদ যায়নি। পাত্রপাত্রীর গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে গেইট ধরা, বরের জুতা লুকানো পর্যন্ত সকল বিষয় আছে। আরো মজার ব্যাপার হল খোদ আমেরিকাতেই পাত্র পাত্রী থাকে কিন্তু কেউ কাউকে আগে চিনত না। একজন আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী মহিলা এ বিয়ের ঘটকালি করেছে। লক্ষ্য করলাম, অনেকেই ঘটক মহিলার পরিচয় জেনে নিল। এগারো সেপ্টেম্বর ঘটনার পর আমেরিকায় ভিসা পাবার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে সেকারণে এখন প্রবাসী ছেলেমেয়েরা কেউ আর দেশে গিয়ে বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না। অস্টিনে বসেই একটি খবর শুনলাম যে একজন বাংলাদেশী ছেলে আমেরিকাতেই কোনো একটি ইউনিভার্সিটিতে এম. এস. করছিল। ছেলেটির বউ ঢাকায় আমেরিকান দৃতাবাসে পর পর দুইবার ভিসার জন্য দাঁড়িয়ে দুইবারই ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্যে ছেলেটি নিজেই ঢাকায় এসে বটকে সঙ্গে নিয়ে ভিসার জন্য দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বটটি এবারও ভিসা পেতে ব্যর্থ হয়েছে, উপরতু আমেরিকান দৃতাবাস নাকি ছেলেটির ভিসাও বাতিল করে দিয়েছে।

আগামী কাল পহেলা ফেব্রুয়ারি, আমরা আবার ডালাস যাব, সেভাবেই ঠিক করা হয়েছে। আমি প্রথমবার যখন ডালাসে যাই তখন সালামত দুই সঙ্গাহের ছুটিতে দেশে বেড়াতে গিয়েছিল। সেকারণে সালামতের সঙ্গে তখন দেখা হয়নি। সালামত আসার পর আবার আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ওদের বাসায়। আমি যাব সে উপলক্ষে সালামত মীগা ওদের

আরো কয়েকজন বন্ধুকেও দাওয়াত দিয়েছে। এখানে শুক্রবার সবাই সাধারণত একটু দেরিতে বাসায় ফেরে। শনিবার ও রবিবার সাম্প্রতিক ছুটির দিন, উইক এন্ড, তাই অনেকেই শুক্রবার অফিস থেকে ফেরার পথে সাম্প্রতিক কেনাকাটা করতে যায়। আবার কেউ কেউ বন্ধু বাস্তবদের বাসায় আড়া দিতে যায়। কনকরাও তাই করে, কিন্তু আগামী কাল ডালাস যাব বলে কনক অফিস থেকে সোজা বাসায় চলে এল। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু আগে শুধু পড়লাম। আমি ভোরে উঠে নামাজ পড়ে নিজেই নাস্তা তৈরি করে খেয়ে নিলাম। কনক যতই বলুক অনেক সকালে রওয়ানা দেব কিন্তু আজ শনিবার বিছানা থেকে উঠতে মন চায় না। সংগ্রহের পাঁচটি দিন প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শনিবার সকালটা সবার কাছে খুব প্রিয়। যখন মনে হয় আগামী কাল রবিবারও ছুটি তখন মনটা এমনিতেই খুশিতে ভরে গঠে।

আমি আমার বেডরুম থেকে বিভিন্ন পর্যন্ত পায়চারি করছি আর তসবিহ হাতে নিয়ে দেয়া পড়ছি। ঠিক সাড়ে নয়টার দিকে কনক ওর বেডরুম থেকে হস্তদস্ত হয়ে বের হয়ে এসে টিপ্পিটা অন করল। ওর চেহারা দেখে মনে হল কিছু একটা ঘটেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আঘা চ্যালেঞ্জার ক্রাশ করেছে। কনকের পেজার নবৰুটি সিএনএন এর কাছে দেয়া আছে। যে কোনো ব্রেকিং নিউজ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে পেজারে জানিয়ে দেয়া হয়। এর যাবতীয় বিল তার অফিসই বহন করে। চ্যালেঞ্জার ক্রাশের খবর শুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে নভোচারীদের একজনও রেঁচে নেই। বারবার মনে হচ্ছে ওদের পরিবারের সদস্যদের কথা। তারা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন দেখা হবে প্রিয়জনদের সঙ্গে। কনক ঘুরে ফিরে সব কয়টি নিউজ চ্যানেলের খবর শুনল। খবর শুনে বোঝা গেল ডালাসের আশেপাশে চ্যালেঞ্জারের বেশ কিছু ভগ্নাংশ এসে পড়েছে। টিভিতে বারবার সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোথাও কোনো মেটাল জাতীয় জিমিস পড়ে থাকতে দেখে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যেন পুলিশকে খবর দেয়া হয়। কেউ সেটা স্পৰ্শ করবে না, এরকম আরো অনেক সতর্কবাণী প্রচার করা হল। আমেরিকায় কয়েকদিনব্যাপী শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের বের হতে হতে দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল। এখানে এমনিতেই রাস্তাঘাটে গাড়ি ছাড়া লোকজন খুব একটা চোখে পড়ে না। তার ওপর আজ শনিবার ছুটির দিন, রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা বললেই চলে। রাস্তার পাশে অনেক গ্যাস স্টেশন, পুলিশ স্টেশনসহ বেশ কিছু সরকারি অফিস চোখে পড়ল যেখানে আমেরিকার পতাকা উঠছে। আবাক লাগছে দেখে যে কোথাও পতাকা অর্ধনমিত, আবার কোথাও পতাকা মাথা উঁচু করে উঠছে। বোঝা গেল, আজ ছুটির দিন তাই সবাই ছুটি উপভোগ করছে। যেসব অফিস ছুটির দিনেও খোলা থাকে শুধু সেসব অফিসেই পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে।

কনক বলছিল আমাকে ঘোড়া দেখাতে নিয়ে যাবে। আমার ধারণা ছিল ডালাস যাবার পথে কোনো ব্যাখ্যে চুকে হয়ত ঘোড়া দেখব। আমি আবার ঠাট্টা করে বললাম, পারিসা আর আমি দুজনে মিলে একটি ঘোড়া বাসায় নিয়ে আসব। ডাউনটাউন পাশ কাটিয়ে আরো কিছুদূর সামনে গিয়ে গাড়ি থামল, এবার ঘোড়ার দেখা পেলাম। তিনি দিকে পনেরো তলা বিশাল বিশাল বিল্ডিং, সামনে দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে, মাঝখানে খুবই প্রশংসন্ত চতুর। চতুরের মাঝখানে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। সেই জলাশয়ের ওপর দিয়ে

বড়ো বড়ো পাথরের তৈরি ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। জলাশয়ের মাঝে মাঝে ঘোয়ারা দিয়ে এমনভাবে পানি ছাড়িয়ে পড়ছে যে মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলোর খুরের আঘাতেই পানি ছিটকে আসছে। এতক্ষণে ঘোড়া রহস্য উদ্ঘাটিত হল। তবে সত্য ঘোড়া না হলেও এগুলো এত সুন্দর যে দেখে মন ভরে যায়। ঘোড়াগুলো উইলিয়ম ক্লোয়ারে আর তার ঠিক উটে পাশে পূর্ব দিকের কোণে হাইওয়ের পাশে খুব বড়ো একটি ফুলের ঘড়ি। হাইওয়ে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছিল, পায়ে হেঁটে রাত্তা পার হতে সাহস করলাম না। রাস্তার এপাশে দাঁড়িয়েই ফটো তোলা হল। এর আগে আরেকবার যখন ডালাস এসেছিলাম তখন ডাউনটাউনের পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করেছি, আজ ভেতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, চারদিকে আলো ঝলমল করছে। উচু উচু আকাশচূর্ণী বিল্ডিংগুলোর চূড়ায় প্রচুর আলোর ব্যবস্থা আছে। এমন কি বেশি উচু বিল্ডিংগুলোর গায়েও নিয়ন লাইট বসানো যাতে আকাশে প্রেন থেকে বিল্ডিংগুলোর অবস্থান বোঝা যায়। আজ শনিবার, খুব কমই লোকজন দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়াও খুব সুন্দর। গরম কাপড় পরার দরকার হচ্ছে না। সুন্দর বিরিবিরে ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়ে যায়। ডালাস ডাউনটাউনের সৌন্দর্য দেখে নেবার পর সালামতের বাসায় এলাম। সালামত কেবল দেশ থেকে ফিরেছে তাই সব টাটকা খবর ওর কাছ থেকে শুনলাম। সালামতের বাসার দাওয়াতে তার এবং নীপার বেশ কয়েকজন বন্ধু স্পরিবারে এসেছে। সালামত কনক রিঙ্কু এরা সবাই কমন বন্ধু, এরা সবাই বুয়েটের একই ব্যাচের ছাত্র এবং সেখান থেকে বন্ধু। গল্প খুব জমে উঠল। আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনা, ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ইত্যাদি। একটি বিষয় বারবার আলোচনায় ফিরে এল তা হল বাংলাদেশী পুরুষদের রেজিস্ট্রেশন, এটা সকলকেই কেমন একটি বিব্রতকর অবস্থায় যেন ফেলে দিয়েছে।

এখানে টেলিভিশনে আবহাওয়ার খবরে আমি কোনো ভুলক্রটি দেখিনি। যে দিনের যে রিপোর্ট সে দিনে আবহাওয়ার বাস্তবতা দেখা গেছে সেভাবেই। হয় ফেক্স্রয়ারি আবহাওয়ার খবরে বলল আগামী কাল অস্টিন নর্থে বরফ পড়বে। আমি মহাখুশি, সিনেমায় দেখেছি অনেক। বাস্তবে এটাই হবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, নিচয়ই মনে রাখার মত হবে। কনক বলল, গত ছয় বছরে অস্টিনে বরফ পড়েনি। সুতরাং তুমি এত খুশি হয়ো না। ওয়েদার ফেরকাস্ট সব সময় ঠিক হয় না। তবু আমি রাতে কয়েকজন উচ্চ জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম বরফ পড়ছে কিনা। না, বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু বরফ পড়ছে না। দেশে শিলাবৃষ্টি অনেক দেখেছি সেগুলো বরফ কিন্তু পেজাতুলোর মত নয়। সেগুলো দিয়ে তিল ছুড়ে কাউকে আহত করাও যায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। ভোরবেলা কনকের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কনক ডাকছে, আমা তাড়াতাড়ি ওঠ, বরফ পড়ছে। আমি বাইরে এসে দেখি আশে পাশের সব বাড়ির ছাদ একেবারে সাদা হয়ে আছে। বাইরে রাখা গাড়িগুলোর সামনের আর পেছনের কাঁচ বরফে ঢেকে আছে। সিনেমায় যেভাবে দেখেছি দৃশ্যগুলো অবিকল সে রকমের। অন্তত লাগল, আমার মনে হল শোভন আর শাওন কাছে থাকলে ওদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে এগুলো দেখাতাম। বারান্দার রেলিংয়ে যে বরফগুলো জমে ছিল তা জড়ে করে একটি আইস বল বানালাম। আমার উৎসাহ দেখে কনক আমাদের সবাইকে নিয়ে সকাল স্কাল, সাতটার সময়েই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বরফ দেখাতে। কনকের বাসার সঙ্গেই গাড়ির গেরেজ, গাড়ি ভেতরে থাকে এর কাঁচে বরফ জমেনি। দেখলাম, উৎসাহ কেবল আমার নয়, খোদ আমেরিকানদেরও উৎসাহ অনেক।

যেসব গাড়ির কাঁচে বরফ জমে আছে সেগুলোর মালিকরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাড়ির পাশে হাসিমুখে ঘোরাফেরা করছে। অনেকেই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু গাড়ির পেছনের কাঁচে জমে থাকা বরফ তখনো পরিষ্কার করেনি। আমার মনে হল, যেন তারা গর্ব করে দেখাল যে তোমরা দেখ আমার গাড়িতে বরফ পড়েছে। এটা আমার কথা, ঠিক তাদের কথা কিনা বলতে পারি না। আসলে অষ্টিনে বরফ সচরাচর পড়ে না। ছয় সাত বছর পর পর হয়ত কখনো একদিন পড়ে। কনক গাড়ি চালিয়ে সাউথের দিকে চলল কিন্তু দেখা গেল সাউথে খুব একটা বরফ পড়েনি, যা একটু আধটু ছিল তা এতক্ষণে গলে পানি হয়ে গেছে।

এবার অষ্টিনে কোরবানীর সৈদ হল ফেক্রুয়ারির এগারো তারিখে। সৈদে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আমেরিকায় সকল টেটে একদিনে সৈদ হয় না। মনে হল, এটাই স্বাভাবিক। এত বড়ো দেশ তাই চাঁদ তো সবখানেই এক সঙ্গে বা এক সময়ে দেখা যাবে না। আরো অবাক লাগল, একই টেটের সকল শহরে এমন কি এক শহরেই সর্বত্র একই দিনে হল না। কোথাও কোথাও একই শহরে দুই দিনে সৈদের জামাত হয়েছে। আমার ভাগ্য তালো যে অষ্টিনে এক দিনেই সৈদের জামাত হয়েছে। এবার কোরবানীর সৈদ উইক ডেতে হয়েছে তাই যারা চাকুরিজীবী তারা প্রায় সকলেই ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কিন্তু যারা ছাত্র তাদের ছুটি নেই। তারা সকলেই ক্লাস করেছে সৈদের দিন। এখানে দুইভাবে কোরবানী দেয়া যায়, একটি হল হালাল ফুডের দোকানে টাকা দিলে তারাই কোরবানীর ব্যবস্থা করে দেয়। মাংস ভাগ করে প্রাপ্য মাংস মালিককে দিয়ে দেয় এবং বাকি মাংস বিক্রি করে টাকা মসজিদ ফাফে পাঠিয়ে দেয়। আরেক প্রকারে কোরবানীর ব্যবস্থা হল নিজে কোনো র্যাঙ্কে গিয়ে খাসি কিনে কোরবানী দেয়। কনক আর ওর বৰু শীমু দুইজনেই সৈদের এক সঙ্গাহ আগে গিয়ে একটি র্যাঙ্কে খাসি বুক করে এল। র্যাঙ্কের মালিক একজন প্যালেন্টাইনী মুসলমান। কনকদের সময় নিয়েছে বিকাল পাঁচটা। বোৱা গেল অনেক মুসলমানই এখানে কোরবানীর ব্যবস্থা করেছে।

নাহিদের সঙ্গে তিন দিন ক্লাস হয়। সোমবার মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার, এর মধ্যে মঙ্গলবার দুটো ক্লাস আর একটি পরীক্ষা থাকে। এগারো তারিখে সৈদ হওয়াতে নাহিদের খুব অসুবিধা হল, কারণ এদিন ছিল মঙ্গলবার। নাহিদ সারারাত জেগে অনেক রকমের রান্না করল। সৈদের দিন সকালে আমরা জামাতে সৈদের নামাজ পড়ার জন্য রওয়ানা হলাম। রোজার সৈদে কলকরা নাবি ভালোভাবে সৈদের নামাজ পড়তে পারেনি। তখন যে অডিটোরিয়ামে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা বেশ ছোটো ছিল, পুরো জামাতের দাঁড়ানোর জায়গা হয়নি। কনকদের সেখানে পৌছাতে একটু দেরীও হয়েছিল, ওরা জায়গা পেয়েছিল বাইরে ফুটপাতে, তাও মাত্র মোনাজাত পেয়েছিল। এবার নামাজের সময় দেয়া হয়েছে সকাল আটটায়। আমরা বাসা থেকে সোয়া সাতটায় বেরিয়েছি। এদিন অফিস তে হওয়াতে সকালে রাস্তায় গাড়ির ভিড় ছিল, দুবার জ্যামে আটকা পড়তে হল এবং সেখানে পৌছাতে পৌছাতে সোয়া আটটা বেজে গেল। তবু ভাগ্য তালো, নামাজ শুরু হল সাড়ে আটটায়। এবার বিশাল বড়ো একটি অডিটোরিয়াম ভাড়া করা হয়েছে, ফলে বেশ খনিকটা জায়গা থালি পড়ে ছিল। জীবনে এই প্রথম জামাতে সৈদের নামাজ পড়লাম, সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কত দেশের মুসলমান মেয়ে পুরুষ সব এসেছে সৈদের জামাতে নামাজ পড়তে। সাদা কালো বাদামী সব রকমের মানুষের সমাবেশে জায়গাটা গমগম

করছে। যে যাকেই দেখছে সবাই একগাল হেসে সৈদ মোবারক বলছে। নামাজের পর পরিচিত ও অপরিচিত অনেক বাংলাদেশীর সঙ্গে দেখা হল। নামাজের পর সকল বাচ্চাকে উপহার হিসাবে খেলনা দেয়া হল। পারিসাও সুন্দর উপহার পেল। কনক যদিও অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিল তবু জুরুরী মিটিং থাকার কারণে ওকে দুপুর এগারোটার দিকে ঘন্টা দূরেকের জন্য অফিসে যেতে হল। দুপুরে আমরা সবাই নাহিদের রান্না করা সৈদ স্পেশাল খাবার খেলাম। আমার সারাদিন দেশের কথা মনে হচ্ছিল। দেশে সৈদের দিন এত মেহমান আসে যে একটুও বসার সময় পাই না। আমি আমার ছেলেমেয়েদের সৈদের দিন ঘরে বসে থাকাটা একদম পছন্দ করি না। এই একটি দিন, পাড়া প্রতিবেশী আঘায় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, সৈদের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করবে। উইক ডেতে সৈদ হওয়াতে এখানে সারাদিন কেউ বেড়াতে এল না। বিকাল চারটার দিকে নাহিদকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে কনক আর ওর বন্ধু শীমু কেরাবানী দিতে র্যাঙ্কে চলে গেল, আমি আর পারিসা বাসায় থাকলাম। রাত সাড়ে আটটার সময় নাহিদকে সঙ্গে নিয়ে কনক বাসায় ফিরল। র্যাঙ্ক থেকেই মাংস তিনভাগ করে তিনটি আলাদা ব্যাগে ভরে রেখে দিয়েছিল। রাতে বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট এয়ারপোর্ট হ্যাভেনে অনুষ্ঠান আছে। সেকারণে সকল মাংস ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে আমরা সবাই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের পৌছাতে রাত নয়টা বেজে গেল। তখন প্রায় সকলেরই খাওয়া দাওয়া শেষ, এদিকে ওপরের তলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও শুরু হয়ে গেছে। আমাদের জন্য শীমু আর ওর বউ তারি অপেক্ষা করছিল। আমরা সবাই একসঙ্গে সৈদের খাওয়া দাওয়া করলাম। এখানে জন প্রতি আট ডলার দিয়ে কুপন কিনে থেকে হল, সেটাই নিয়ম। খাওয়া শেষ করে ওপরে উঠে গেলাম অনুষ্ঠান দেখতে। ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈদের আনন্দ যেন গায়ে এসে লাগল। ঘর ভর্তি লোক আর সবাই বাংলাদেশী। একটি মেয়ে সুন্দর গলায় সাবিনা ইয়াসমিনের একটি পুরানো গান গাইল। বসার জায়গা পাছিলাম না। নাহিদ অনেক খুঁজে পেতে আমাকে একটি চেয়ার জোগাড় করে দিল। এক ঘন্টা বসে অনুষ্ঠান দেখলাম। পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গে গল্প করলাম। আমার বয়সী দুই তিনজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। তারা সবাই আমার মত ছেলের বাসায় বেড়াতে এসেছে। একজন মহিলা চুপচাপ বসে আসে দেখে আমি উদ্যোগী হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করলাম। মহিলা তিন মাস হল এখানে এসেছে, আরো তিন মাস থাকবে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হল দেশের জন্য মহিলা অস্থির হয়ে উঠেছে, আর থাকতে মোটেই ভালো লাগছে না। আরো একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল, তার পাঁচ ছেলেমেয়ে। তাদের একজন মাত্র বাংলাদেশে আছে বাকি চারজনের মধ্যে একজন ইংল্যান্ডে। তিনজন আমেরিকায়। তাকে দেখলাম খুব হাসিখুশি। এ মাসেই নাকি মহিলা আনিকার্ড হাতে পাবে, সে কথাই বারবার বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হল। খুব উঁচু দরের অনুষ্ঠান না হলেও প্রবাস জীবনে এখানে কিছুটা সৈদের আনন্দ পাওয়া গেল। আরো দুটো নতুন তথ্য সামনে এল। এখানে মুসলমানেরা আরো দুভাবে সৈদের আনন্দ উপভোগ করে, একটি পটলা অপরাটি হল কাফেলা। পটলা হল কোনো একজনের বাসায় সৈদের খাওয়া দাওয়া দেয়ে। যারা উপস্থিত হবে তারা সকলে নিজ নিজ বাসা থেকে এক বা দুই পদের খাবার রান্নাবান্না করে সঙ্গে নিয়ে আসবে। আর কাফেলা হল অনেকে একত্রে হয়ে বিভিন্ন বাসায় বেড়াতে যাবে। উইক এন্ডে সৈদ হলে এ ধরনের আয়োজন সফল। এগুলো সবাই সামাজিক মেলামেশার অংশ, পরিবেশ পরিস্থিতিই এভাবে সব কিছু সৃষ্টি করে দিয়েছে।

পাঁচ.

চৌদ্দ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন দিবস। গত সাত দিন ধরে টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে শুধু এই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। পারিসার টুকুটকে লাল একটি সোয়েটার আছে যেটার জিপারের সঙ্গে মেটালের একটি হার্ট ঝুলানো। পারিসা এ হার্টটি দেখিয়ে আমাকে বলল, দাদু দেখে আমার ভ্যালেন্টাইন ডে। পারিসা তার ছেটো বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পেরেছে যে হার্টের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডের একটি সম্পর্ক আছে। এখানকার শপিং সেন্টারগুলোতে ক্রিসমাস এর পর ভ্যালেন্টাইন ডের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে কার্ড চকোলেট পোশাক খেলনা খাবার দাবার ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। বলাই বাহ্যিক যে, এখানে হার্ট শেপ এর প্রাধান্য বেশি। এই দিন ওরা মা বাপ ভাইবোন স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে আঞ্চায় স্বজন বন্ধুবাদীর এমন কি পোষা পশুপাখিকে পর্যবেক্ষ উপহার দেয়, কার্ড পাঠায়। এটা পাশ্চাত্যের কালচার তবে আমাদের দেশেও ইদানিং এ কালচার আমদানীর চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে যে কালচার আমাদের নয় তা এহণ করার অর্থ হল কাকের ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করার মত অবস্থা। আমেরিকায় দেখলাম ভ্যালেন্টাইন দিবসের অর্থ হল সবার জন্য ভালোবাসা। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আঠারো বছরের পর থেকেই ছেলে মেয়েরা মা বাবার পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া চাকুরি বা জীবিকার প্রয়োজনে আপনজনের নিকট থেকে এত দূরে থাকতে হয় যে এই একটি বিশেষ দিনে প্রিয়জনকে আপনজনকে কার্ড পাঠিয়ে স্বরণ করা হয়, উদ্দেশ্য একথা জানানো যে আমি বা আমরা কেউ দূরে নেই। আমাদের দেশে এই দিনটির নাম করা হয়েছে ভালোবাসাবাসি দিবস। আমাদের দেশে এ দিবসটি পালিত হয় 'সবার জন্য ভালোবাস' এ শ্লোগান দিয়ে নয়। এখানে দুর্ভাগ্যবশত এ দিবসটির মধ্য দিয়ে শুধু প্রেমিক প্রেমিকা, যুবক যুবতীদের পরম্পরের মধ্যে ভালোবাসার প্রকাশই কেবল থাকে। এই দিনে স্কুল কলেজের সামনে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার প্রবণতা দেখা দিছে, ক্রমেই এটা বেড়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের পরিবারগুলো দিনকে দিন ছেটো হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর পরম্পরের মধ্যেকার সম্পর্কও আলগা হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য আঞ্চায় স্বজনের কথা না হয় বাদই দিলাম মা বাবার সঙ্গে স্বতন্ত্রের বছরে একবার দেখা হয় কিনা সন্দেহ। ওদের কাছে সহপাঠী বা সহকর্মীরাই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে হ্যাত বাস্তব কিছু কারণেই। তাই ওরা বছরে ফার্দস ডে, মাদার্স ডে, ফ্যামিলি ডে ইত্যাদি নামে একটি বিশেষ দিন হিসেব করে স্বরণ করতে চায় যে তাদের মা বাবা পরিবার ছিল, আছেও। আমাদের দেশে এখনো সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা হচ্ছে পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অথচ এখনে পাশ্চাত্যে পরিবারের সবচেয়ে অবহেলিত প্রাণী হচ্ছে বয়স্ক সদস্যরা, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। আমার নিজের মায়ের কথাই ধরি না কেন। আমার বাবা অনেক দিন হল বেঁচে নেই। আমার মা আমার ভাইয়ের সংসারে ভাইয়ের সঙ্গেই থাকে। মার বয়স আশির ওপর, বার্দক্যের নানাবিধ জটিলতার কারণে মা এখন একেবারেই চলাফের করতে পারে না। আমরা সব সময় খেয়াল রাখি যাতে মা মনে কষ্ট না পায় বা কোনো কারণে রাগ না করে। আমার নাতি পারিসার বয়স এখন প্রায় সাড়ে তিন বছর, আমার ভাইবোনেরা এই বয়সে এসেও একজন অন্যজনের

কলোরাডো নদীর তীরে

ওপর কোনো কারণে রাগ করলে মার কাছে নালিশ করি। মার কিছু করার ক্ষমতা নেই হ্যাত তা জেনেও এভাবে নালিশ করি। আমার ভাই ভাবি মার সেবা যত্ন করছে, তার ওপর ভাইয়ের ছেলে ও ছেলের বউ, ভাইয়ের দুই মেয়ে পর্যন্ত মার সেবা যত্ন করছে। এরকম পরিবার বাংলাদেশে এখনো অনেক মিলবে। সুতরাং আমাদের দেশে মাদার্স ডে বা ফার্দস ডে কিংবা আরো কোনো ডে পালন করার কী এমন প্রয়োজন? সত্ত্ব বলতে কি, আমাদের দেশে প্রতিদিনই তো ফ্যামিলি ডে। এখনে ঝগড়া ঝাটি কলহ বিবাদ যেমন আছে তেমনি আছে শুন্দি ভালোবাসা, সবার জন্যই।

আজ কনক বাসায় ফিরতে দেরি করছে, আমার বেশ চিন্তা হচ্ছিল। নাহিদ বলল কনক অফিস থেকে বের হয়েছে ঘন্টাখানেক আগে। রাস্তায় কোনো ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে থাকতে পারে। কনক ফিরল রাত সাড়ে আটকায়। আজ ভ্যালেন্টাইন ডে তাই অফিস থেকে ফেরার পথে আমাদের সবার জন্য উপহার কিনে এনেছে। পারিসার জন্য লাল রঙের হার্ট শেপ-এর একটি বড়ো বেলুন, নাহিদের জন্য হাতঘড়ি আর আমার জন্য লাল রঙের চৌদ্দটি তাজা চন্দ্রমল্লিকা ফুল। খুশিতে কনকের চোখমুখ ঝলমল করছিল। সে বলল এবার ভ্যালেন্টাইন ডেতে আমার মেয়ে মা বউ সবাই একত্রে আছে। আমার বুকের ডেরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কেবল জীবিকার তাগিদে আমাদের ছেলেমেয়েরা কত দূরদেশে প্রবাসে পড়ে আছে। মা বাবা ভাইবোন আঞ্চায় স্বজনের থেকে দূরে ভিন্ন এবং কখনো বৈরী পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করছে। প্রতি মুহূর্তে পেতে চাইছে নিজস্ব পরিবেশ, কিন্তু পাছে কই? কেমন যেন টানাপোড়েন অবস্থা। ওদের স্বতান্ত্রের হ্যাত এরকম হবে না তার কারণ তারা এ পরিবেশের মধ্যে বড়ো হবে, এ পরিবেশেরই একজন হবে। আর কী বিকল্প আছে?

বেলুন পেয়ে পারিসা মহাখুশি। ঘন্টা দুয়েক খুব আনন্দের সঙ্গে বেলুন নিয়ে খেলা করার পর যখন সাধ মিটে গেল তখন আমার গিফ্টটের সঙ্গে নিজের গিফ্টটি বদল করে নিল। তার মানে বেলুন এখন আমার হাতে ফুলগুলো কোথায় রাখা হবে পারিসা সেটা নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে পারিসার সঙ্গে আমার ভালো আভারটাইডিং হয়ে গেছে। প্রথম দিকে পারিসা আমাকে নিয়ে বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। আৰু আসার পর ওর সব কিছুই শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, কনক ও নাহিদ ওকে যেভাবে গুরুত্ব দেয় সেরকম গুরুত্ব আমাকেও দিছে তা পারিসা লক্ষ্য করছে। কোথাও বেড়াতে গেলে আমাকেও নিয়ে যাচ্ছে। পারিসাকে আইসক্রিম বা ড্রিংকস কিনে দিলে আমাকেও দিছে। ও ঠিক বুঝতে পারছে না আমার পজিশনটা আসলে কী?

সপ্তাহখানেকের মধ্যে পারিসা এবং আমি যখন দুজনের খেলার সাথী হয়ে উঠলাম তখন থেকে আর কোনো সমস্যা থাকল না। নাহিদ এখন পড়াশুনা করছে তার ওপর সংসারের কাজ তো আছেই। কনক সারাদিন অফিসে থাকে। পারিসা এতদিন সব সময় আপন ভুবনেই ব্যস্ত থাকত। ওর বেশির ভাগ সময় কাটত কম্পিউটার নিয়ে। এখন মাত্র সাড়ে তিন বছরের এটুকু মেয়ে, ওর কাছে কম্পিউটার অনেকটা খেলনার মতই। পারিসা একা একাই সিডি বদলে নিয়ে বিভিন্ন গেইম খেলত। আমরা আয়ই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশে ফটো পাঠাতাম। পারিসা এ ফটোগুলো আমাকে দেখাত, একেক সময় পুরো ফটো থেকে

কেবল কনকের মুখটা বড়ো করে দেখাত। আবার কখনো পারিসার নিজের মুখটা আলাদা করে দেখাত। নিজে নিজেই শ্রিন সেভার বদলে দিত। এগুলো কেউ ওকে হাতে ধরে শেখায়িনি। সে নিজে থেকেই শিখে নিয়েছে। ভাবে শিখতে গিয়ে অনেক কাণ্ডও ঘটিয়েছে। কনক তার অফিসের সব কাজই ল্যাপটপে করে। কিন্তু নাহিদের সব কাজ বাসার ডেস্ক কম্পিউটারেই করতে হয়। একদিন নাহিদ তার একটি প্রজেক্টের কাজ অসমাঞ্ছ রেখে অন্য কাজে গেছে। কিন্তুক্ষণ পর এসে দেখে পারিসা পুরো প্রজেক্টের কাজ মুছে ফেলেছে। একদিন তো দেখা গেল পাস ওয়ার্ডই বদলে ফেলেছে, সেদিন কনককে বেশ বামেলা পোহাতে হয়েছে। দুই হাজার তিন সমের জুন মাসে পারিসার চার বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে। ওকে এখন স্কুলে ভর্তি করার চিন্তাবন্ধন করতে হচ্ছে। মন্টেসরি স্কুলগুলো খুব ভালো। এখনে পড়ার খরচ যদিও অত্যন্ত বেশি তবু এখনে এক একজন বাচ্চাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে যে কোনো প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারে। কনক মন্টেসরী স্কুলে খোঁজ নিতে গেল, স্কুল থেকে জানাল যে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত কোনো সীট খালি নেই। শুনে অবাক লাগল, দুই হাজার পাঁচ সাল আসতে এখনো তো অনেক বাকি, এখন দুই হাজার তিন সালের কেবল সূচনা। এরপর যে কথাটা শুনলাম তাতে আর অবাক লাগল না। যেসব মায়ের শিশু এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, পৃথিবীর আলোতে এখনো আসেনি তাদের অভিভাবকরাও এ স্কুলে তাদের অনাগত শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছে। তবে পারিসার কম্পিউটার পারদর্শিতার কথা শুনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি এর মধ্যে কোনো সীট খালি হয় তাহলে তারা জানাবে।

পারিসা নিজের সব কাজ মোটামুটিভাবে নিজে করতে পারে, একটি অভ্যাস এখনো ছাড়েনি সেটা হল ফিডারে দুধ খাওয়া। কনককা কোনো ব্যাপারেই পারিসার ওপর প্রেসার দেয় না। কনকদের যুক্তিটা সম্ভবত ঠিক, স্কুলে যাওয়া শুরু করলে নিজে থেকেই এসব অভ্যাস চলে যাবে। একদিন সবাই বসে গল্প করছিলাম, পারিসা এখন কোথায় খুঁজতে গিয়ে দেখি ও কম্পিউটার রহমে। ডান হাত দিয়ে মাউস টিপে ক্লিক করে গেইম খেলেছে আর বাম হাত দিয়ে ফিডার ধরে দুধ খাচ্ছে। একেই বলে টুয়েন্টি ফার্স্ট সেক্ষুরিভ আদর্শ শিশু, পারিসা তার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, সঠিকভাবেই।

কনক আর নাহিদ একত্রে বাইরে গেলে সব সময়ই পারিসাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত, বিকল্প ছিল না তা ঠিক। বাসায় তো ওকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার যাবার পর প্রথম দিকে ওদের সঙ্গে আমিও বাইরে যেতাম। পারিসা যখন ক্রেমেই আমার সঙ্গে অভ্যন্ত হয়ে এল তখন মাঝে মাঝে পারিসাকে আমার সঙ্গে বাসায় রেখে ওরা বাইরে যেত। নাহিদের সঙ্গাতে তিন দিন ক্লাস হয় এবং ক্লাসগুলো হয় সক্ষ্যার সময়। কনক বিকালে অফিস থেকে ফিরে নাহিদকে ক্লাসে পৌছে দিয়ে আসত, তারপর ছুটি হলে আবার নিয়ে আসত। এরকম রুটিনের মধ্যে একদিন নাহিদ আমাকে আস্তে করে বলল, পারিসা আপনার সঙ্গে খেলা করছে করুক। কনক নীচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি। নাহিদের ক্লাস যেখানে হয় সেটা পাঁচ মিনিটের পথ, নাহিদকে পৌছে দিয়ে কনকের বাসায় ফিরে আসতে মিনিট পনেরো বিশের বেশি লাগবে না। পারিসা কম্পিউটার নিয়ে গেইম খেলছিল, হাঠাং কি মনে করে বলল, দানু মাকে ডাকি। যা তো ক্লাসে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি ওকে

থামালাম। সে ততক্ষণে বাবাকে ডাকি বলে বেডরুমের দিকে দৌড় দি ঘাবড়ে গেলাম, যদি কান্নাকাটি শুরু করে তাহলে কিভাবে আমি সামাল। পারিসার স্কুলগুলো না। একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি কনককা পারিসার সঙ্গে সব সময় সাঠৰ কথা বলে। আমি চিন্তা করে ওঠার আগেই পারিসা এ ঘর ও ঘর ঘুরে মা বাবাকে না পেয়ে আমার সামনে এসে চোখ গোল্পা করে দুই হাত মাথার ওপর তুলে বলল, দানু দে অল গন। পারিসার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমার খুব হাসি পেল। হাসতে হাসতে বললাম তাতে কি হয়েছে এস আমরা হাইড এন্ড সিক খেলি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। হাইড এন্ড সিক পারিসার খুব প্রিয় খেল। এরপর থেকে কনককা বাইরে গেলে আমরা দুজনে স্বাধীনভাবে হাইড এন্ড সিক খেলতাম। দানু আর নাতনী বয়সের পার্থক্য ভুলে একেবারে সমবয়সী হয়ে গেলাম, দুজনে পরম্পরারে বন্ধু হয়ে গেলাম। একের ছাড়া অন্যের চলে না। একত্রে সারাদিন খেলতাম, এক সঙ্গে বাইরে যেতাম বেড়াতে, আর যৌথ অপরাধের জন্য দুজনে একত্রে বকুনি খেতাম। কখনো শপিংয়ে গেলে দুজনের জন্য নিশ্চিত দুটো কুলপি বরাদ্দ থাকত। একদিন যথারীতি কেনাকাটার পর নাহিদ পারিসাকে জিজাসা করল কুলপি খাবে কিনা। পারিসা আইসক্রিমের কাপের প্রতি আগ্রহ দেখাল। নাহিদ বারবার পারিসাকে বলল দানু কিন্তু কুলপি খাবে, তুমি পরে কুলপির জন্য কান্নাকাটি করতে পারবে না। পারিসার একই কথা আমি কাপ খাব। গাড়িতে বসে কাগজের র্যাপার খুলে যেই কুলপি মুখে দিয়েছি অমনি পারিসা বলে উঠল, মা আমি কাপ খাব না, কুলপি খাব। কিন্তু সেটা তো আর হবার নয়। নাহিদের কড়া হুকুম, যাকে যেটা কিনে দেয়া হয়েছে সেটাই তাকে থেতে হবে। বুরালাম বদলে নেবার উপায় নেই। পারিসা জোরে জোরে চামচ দিয়ে কাপ থেকে আইসক্রিম ভুলে খাচ্ছে। মনের রাগ আইসক্রিমের ওপর তুলে নিছে। মাঝে মধ্যে আইসক্রিম ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়ছে। আমার গায়ে এবং আশে পাশে আইসক্রিম সব টিস্যু দিয়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। পারিসার খাওয়া শেষ। এবার আস্তে ফিস ফিস করে পারিসা আমাকে বলল, দানু আমি কুলপি খাব। এরপর সব চুপচাপ, কোনো কথা নেই। কনক গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প করছিল। হঠাৎ ওর মনে হল আমি বোধ হয় ওর কথা ঠিকমত শুনছি না। কি ব্যাপার, আমা তুমি আমার কথা শুনছ না, কনক জিজেস করল। ধরা পড়ে গেলাম, আস্তে আস্তে বললাম, আসলে আমরা কুলপি খাওয়ায় ব্যস্ত সেজন্য তোমার কথা খেয়াল করে শুনতে পারিনি।

আমাদের বড়ো যেয়ে কাস্তা জেসমিন ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সাক্রামান্টোতে থাকে। কাস্তা বিয়ে হয়েছে বছরখানেক হল। ওর স্বামী আমিনুর রহমান, ডাক নাম জয়েল, বুয়েট থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রাইয়েট। এরপর টেক্সাসের আর্লিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে একই বিষয়ে এম. এস. করে এখন ইন্টেল-য়ে চাকুরিরত, পোস্টিং ক্যালিফোর্নিয়াতে। ছুটি শেষ বলে বিয়ের মাত্র দুদিন পরেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল, কাস্তা ভিসা এবং ভ্রমণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে একাই ক্যালিফোর্নিয়া গেল প্রায় মাসখানেক পর। কাস্তা বুয়েট থেকে আর্কিটেকচারে প্রাইয়েশন করেছে। আমেরিকায় পড়তে যাবার প্রস্তুতি তার আগে থেকেই ছিল, ইতিমধ্যে GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় ভাল স্কোর করে আমেরিকায় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন করেছিল, ভর্তির বিষয় প্রতিয়াধীন ছিল। এসকল বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো উৎসাহ ছিল কনকের, সে দায়িত্ব

কেবল কনকের মুখটা বড়ো করে দেখাত। আবার কখনো পারিসার নিজের মুখটা আলাদা করে দেখাত। নিজে নিজেই ক্রিন সেতার বদলে দিত। এগুলো কেউ ওকে হাতে ধরে শেখায়নি। সে নিজে থেকেই শিখে নিয়েছে। এভাবে শিখতে গিয়ে অনেক কাণ্ডও ঘটিয়েছে। কনক তার অফিসের সব কাজই ল্যাপটপে করে। কিন্তু নাহিদের সব কাজ বাসার ডেক কম্পিউটারেই করতে হয়। একদিন নাহিদ তার একটি প্রজেক্টের কাজ অসমাপ্ত রেখে অন্য কাজে গেছে। কিছুক্ষণ পর এসে দেখে পারিসা পুরো প্রজেক্টের কাজ মুছে ফেলেছে। একদিন তো দেখা গেল পাস ওয়ার্ডই বদলে ফেলেছে, সেদিন কনককে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। দুই হাজার তিন সালের জুন মাসে পারিসার চার বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে। ওকে এখন স্কুলে ভর্তি করার চিন্তাবন্ধন করতে হচ্ছে। মন্টেসেরি স্কুলগুলো খুব ভালো। এখনে পড়ার খরচ যদিও অত্যন্ত বেশি তবু এখনে এক একজন বাচ্চাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে যে কোনো প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারে। কনক মন্টেসেরী স্কুলে থোঁজ নিতে গেল, স্কুল থেকে জানাল যে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত কোনো সীট খালি নেই। শুনে অবাক লাগল, দুই হাজার পাঁচ সাল আসতে এখনো তো অনেক বাকি, এখন দুই হাজার তিন সালের কেবল সূচনা। এরপর যে কথাটা শুনলাম তাতে আর অবাক লাগল না। যেসব মায়ের শিশু এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, পৃথিবীর আলোতে এখনো আসেনি তাদের অভিভাবকরাও এ স্কুলে তাদের অনাগত শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছে। তবে পারিসার কম্পিউটার পারদর্শিতার কথা শুনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি এর মধ্যে কোনো সীট খালি হয় তাহলে তারা জানবে।

পারিসা নিজের সব কাজ মোটামুটিভাবে নিজে করতে পারে, একটি অভ্যাস এখনো ছাড়েনি সেটা হল ফিডারে দুধ খাওয়া। কনকরা কোনো ব্যাপারেই পারিসার ওপর প্রেসার দেয় না। কনকদের যুক্তিটা সম্ভবত ঠিক, স্কুলে যাওয়া শুরু করলে নিজে থেকেই এসব অভ্যাস চলে যাবে। একদিন সবাই বসে গল্প করছিলাম, পারিসা এখন কোথায় খুঁজতে গিয়ে দেখি ও কম্পিউটার রুমে। ডান হাত দিয়ে মাউস টিপে ক্লিক করে গেইম খেলছে আর বাম হাত দিয়ে ফিডার ধরে দুধ খাচ্ছে। একেই বলে টুয়েনটি ফার্স্ট সেঞ্চুরির আদর্শ শিশু, পারিসা তার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, সঠিকভাবেই।

কনক আর নাহিদ একত্রে বাইরে গেলে সব সময়ই পারিসাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত, বিকল্প ছিল না তা ঠিক। বাসায় তো ওকে একা রেখে যাওয়া সত্ত্ব নয়। আমার যাবার পর প্রথম দিকে ওদের সঙ্গে আমিও বাইরে যেতাম। পারিসা যখন ক্রমেই আমার সঙ্গে অভ্যন্ত হয়ে এল তখন মাঝে মাঝে পারিসাকে আমার সঙ্গে বাসায় রেখে ওরা বাইরে যেত। নাহিদের সঙ্গে তিন দিন ক্লাস হয় এবং ক্লাসগুলো হয় সক্ষ্যার সময়। কনক বিকালে অফিস থেকে ফিরে নাহিদকে ক্লাসে পৌছে দিয়ে আসত, তারপর ছুটি হলে আবার নিয়ে আসত। এরকম রুটিনের মধ্যে একদিন নাহিদ আমাকে আস্তে করে বলল, পারিসা আপনার সঙ্গে খেলা করছে করুক। কনক নীচে গাঢ়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি। নাহিদের ক্লাস যেখনে হয় সেটা পাঁচ মিনিটের পথ, নাহিদকে পৌছে দিয়ে কনকের বাসায় ফিরে আসতে মিনিট পনেরো বিশের বেশি লাগবে না। পারিসা কম্পিউটার নিয়ে গেইম খেলছিল, হঠাৎ কি মনে করে বলল, দাদু মাকে ডাকি। মা তো ক্লাসে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি ওকে

থামালাম। সে ততক্ষণে বাবাকে ডাকি বলে বেডরুমের দিকে দৌড় দিল। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, যদি কান্নাকাটি শুরু করে তাহলে কিভাবে আমি সামাল দেব ঠিক বুবাতে পারছিলাম না। একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি কনকরা পারিসার সঙ্গে সব সময় সঠিক কথা বলে। আমি চিন্তা করে ঘোষাল আগেই পারিসা এ ঘর ও ঘর মুরে মা বাবাকে না পেয়ে আমার সামনে এসে চোখ গোলা করে দুই হাত মাথার ওপর তুলে বলল, দাদু দে অল গন। পারিসার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমার খুব হাসি পেল। হাসতে হাসতে বললাম তাতে কি হয়েছে এস আমরা হাইড এন্ড সিক খেলি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। হাইড এন্ড সিক পারিসার খুব প্রিয় খেলা। এরপর থেকে কনকরা বাইরে গেলে আমরা দুজনে স্বাধীনভাবে হাইড এন্ড সিক খেলতাম। দাদু আর নাতনী বয়সের পার্থক্য ভুলে একেবারে সমবয়সী হয়ে গেলাম, দুজনে পরম্পরারের বন্ধু হয়ে গেলাম। একের ছাড়া অন্যের চলে না। একত্রে সারাদিন খেলতাম, এক সঙ্গে বাইরে যেতাম বেড়াতে, আর যৌথ অপরাধের জন্য দুজনে একত্রে বকুনি খেতাম। কখনো শপিংয়ে গেলে দুজনের জন্য নিশ্চিত দুটো কুলপি বরাদু থাকত। একদিন যথারীতি কেনাকাটার পর নাহিদ পারিসাকে জিজাসা করল কুলপি থাবে কিনা। পারিসা আইসক্রিমের কাপের প্রতি আগ্রহ দেখাল। নাহিদ বারবার পারিসাকে বলল দাদু কিন্তু কুলপি থাবে, তুমি পরে কুলপির জন্য কান্নাকাটি করতে পারবে না। পারিসার একই কথা আমি কাপ থাব। গাড়িতে বসে কাগজের র্যাপার খুলে যেই কুলপি যুক্ত দিয়েছি আমিন পারিসা বলে উঠল, মা আমি কাপ থাব না, কুলপি থাব। কিন্তু সেটা তো আর হবার নয়। নাহিদের কড়া হুকুম, যাকে যেটা কিনে দেয়া হয়েছে সেটাই তাকে খেতে হবে। বুলালাম বদলে নেবার উপায় নেই। পারিসা জোরে জোরে চামচ দিয়ে কাপ থেকে আইসক্রিম তুলে থাচ্ছে। মনের রাগ আইসক্রিমের ওপর তুলে নিছে। মাঝে মধ্যে আইসক্রিম ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়ছে। আমার গায়ে এবং আশে পাশে আইসক্রিম সব টিস্যু দিয়ে যুক্ত পরিকার করলাম। পারিসার খাওয়া শেষ। এবার আস্তে ফিস ফিস করে পারিসা আমাকে বলল, দাদু আমি কুলপি থাব। এরপর সব চুপচাপ, কোনো কথা নেই। কনক গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প করছিল। হঠাৎ ওর মনে হল আমি বোধ হয় ওর কথা ঠিকমত শুনছি না। কি ব্যাপার, আমা তুমি আমার কথা শুনছ না, কনক জিজেস করল। ধরা পড়ে গেলাম, আস্তে আস্তে বললাম, আসলে আমরা কুলপি খাওয়ায় ব্যস্ত সেজন্য তোমার কথা খেয়াল করে শুনতে পারিনি।

আমাদের বড়ো মেয়ে কাতা জেসমিন ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানক্রামন্টোতে থাকে। কাতার বিয়ে হয়েছে বছরখানেক হল। ওর স্বামী আমিনুর রহমান, ডাক নাম জুয়েল, ব্যেট থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েট। এরপর টেক্সাসের আর্লিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে একই বিষয়ে এম. এস. করে এখন ইন্টেল-য়ে চাকুরিরত, পোস্টং ক্যালিফোর্নিয়াতে। ছুটি শেষ বলে বিয়ের মাত্র দুদিন পরেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল, কাতা ভিসা এবং ভ্রমণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে একাই ক্যালিফোর্নিয়া গেল প্রায় মাসখানেক পর। কাতা ব্যেট থেকে আর্কিটেকচারে গ্রাজুয়েশন করেছে। আমেরিকায় পড়তে যাবার প্রস্তুতি তার আগে থেকেই ছিল, ইতিমধ্যে GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় ভাল ক্ষেত্রে আবেদন করেছিল, ভর্তির বিষয় প্রক্রিয়াধীন ছিল। এসকল বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো উৎসাহ ছিল কনকের, সে দায়িত্ব

কেবল কনকের মুখটা বড়ো করে দেখাত। আবার কখনো পারিসার নিজের মুখটা আলাদা করে দেখাত। নিজে নিজেই ক্রিন সেতার বদলে দিত। এগুলো কেউ ওকে হাতে ধরে শেখায়নি। সে নিজে থেকেই শিখে নিয়েছে। এভাবে শিখতে গিয়ে অনেক কাওও ঘটিয়েছে। কনক তার অফিসের সব কাজই ল্যাপটপে করে। কিন্তু নাহিদের সব কাজ বাসার ডেক্স কম্পিউটারেই করতে হয়। একদিন নাহিদ তার একটি প্রজেক্টের কাজ অসম্ভব রেখে অন্য কাজে গেছে। কিছুক্ষণ পর এসে দেখে পারিসা পুরো প্রজেক্টের কাজ মুছে ফেলেছে। একদিন তো দেখে গেল পাস ওয়ার্ডই বদলে ফেলেছে, সেদিন কনককে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। দুই হাজার তিন সন্নে জুন মাসে পারিসার চার বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে। ওকে এখন স্কুলে ভর্তি করার চিন্তাবন্ধন করতে হচ্ছে। মটেসরি স্কুলগুলো খুব ভালো। এখানে পড়ার খরচ যদিও অত্যন্ত বেশি তবু এখানে এক একজন বাচ্চাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে যে কোনো প্রতিযোগিতায় তারা টিকে থাকতে পারে। কনক মন্টেসরী স্কুলে খোঁজ নিতে গেল, স্কুল থেকে জানাল যে দুই হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত কোনো সীট খালি নেই। শুনে অবাক লাগল, দুই হাজার পাঁচ সাল আসতে এখনো তো অনেক বাকি, এখন দুই হাজার তিন সালের কেবল সূচনা। এরপর যে কথাটা শুনলাম তাতে আর অবাক লাগল না। যেসব মায়ের শিশু এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, পৃথিবীর আলোতে এখনো আসেনি তাদের অভিভাবকরাও এ স্কুলে তাদের অনাগত শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছে। তবে পারিসার কম্পিউটার প্রাদর্শিতার কথা শুনে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেছে যদি এর মধ্যে কোনো সীট খালি হয় তাহলে তারা জানাবে।

পারিসা নিজের সব কাজ মোটামুটিভাবে নিজে করতে পারে, একটি অভ্যাস এখনো ছাড়েনি সেটা হল ফিডারে দুধ খাওয়া। কনককা কোনো ব্যাপারেই পারিসার ওপর প্রেসার দেয় না। কনকদের যুক্তিটা সম্ভবত ঠিক, স্কুলে যাওয়া শুরু করলে নিজে থেকেই এসব অভ্যাস চলে যাবে। একদিন সবাই বসে গল্প করছিলাম, পারিসা এখন কোথায় খুঁজতে গিয়ে দেখি ও কম্পিউটার রুমে। ডান হাত দিয়ে মাউস টিপে ফ্লিপ করে গেইম খেলেছে আর বাম হাত দিয়ে ফিডার ধরে দুধ খাচ্ছে। একেই বলে টুয়েনটি ফার্স্ট সেস্বুরির আদর্শ শিশু, পারিসা তার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, সঠিকভাবেই।

কনক আর নাহিদ একত্রে বাইরে গেলে সব সময়ই পারিসাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত, বিকল্প ছিল না তা ঠিক। বাসায় তো ওকে একা রেখে যাওয়া সত্ত্ব নয়। আমার যাবার পর প্রথম দিকে ওদের সঙ্গে আমিও বাইরে যেতাম। পারিসা যখন ক্রমেই আমার সঙ্গে অভ্যন্তর হয়ে এল তখন মাঝে মাঝে পারিসাকে আমার সঙ্গে বাসায় রেখে ওরা বাইরে যেত। নাহিদের সঙ্গাহে তিন দিন ক্লাস হয় এবং ক্লাসগুলো হয় সক্ষ্যার সময়। কনক বিকালে অফিস থেকে ফিরে নাহিদকে ক্লাসে পৌঁছে দিয়ে আসত, তারপর ছুটি হলে আবার নিয়ে আসত। এরকম রঞ্জিনের মধ্যে একদিন নাহিদ আমাকে আস্তে করে বলল, পারিসা আপনার সঙ্গে খেলা করছে করকু। কনক নীচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি। নাহিদের ক্লাস যেখানে হয় সেটা পাঁচ মিনিটের পথ, নাহিদকে পৌঁছে দিয়ে কনকের বাসায় ফিরে আসতে মিনিট পনেরো বিশের বেশি লাগবে না। পারিসা কম্পিউটার নিয়ে গেইম খেলছিল, হঠাৎ কি মনে করে বলল, দাদু মাকে ডাকি। মা তো ক্লাসে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি ওকে

থামালাম। সে ততক্ষণে বাবাকে ডাকি বলে বেডরুমের দিকে দৌড় দিল। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, যদি কান্নাকাটি শুরু করে তাহলে কিভাবে আমি সামাল দেব ঠিক বুরতে পারছিলাম না। একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি কনকরা পারিসার সঙ্গে সব সময় সঠিক কথা বলে। আমি ইচ্ছা করে ওঠার আগেই পারিসা এ ঘর ও ঘর ঘুরে মা বাবাকে না পেয়ে আমার সামনে এসে চোখ গোঁটা করে দুই হাত মাথার ওপর তুলে বলল, দাদু দে অল গান। পারিসার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমার খুব হাসি পেল। হাসতে হাসতে বললাম তাতে বি হয়েছে এস আমরা হাইড এন্ড সিক খেলি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। হাইড এন্ড সিক পারিসার খুব শিয় খেলা। এরপর থেকে কনককা বাইরে গেলে আমরা দুজনে স্বাধীনভাবে হাইড এন্ড সিক খেলতাম। দাদু আর নাতনী বয়সের পার্থক্য ভুলে একেবারে সমবয়সী হয়ে গেলাম, দুজনে পরম্পরারের বন্ধু হয়ে গেলাম। একের ছাড়া অন্যের চলে না। একত্রে সারাদিন খেলতাম, এক সঙ্গে বাইরে যেতাম বেড়াতে, আর যৌথ অপরাধের জন্য দুজনে একত্রে বহুনি খেতাম। কখনো শপিংয়ে গেলে দুজনের জন্য নিচিত দুটো কুলপি বরাদ্দ থাকত। একদিন যথারীতি কেনাকাটার পর নাহিদ পারিসাকে জিজ্ঞাসা করল কুলপি খাবে কিন। পারিসা আইসক্রিমের কাপের প্রতি আগ্রহ দেখাল। নাহিদ বারবার পারিসাকে বলল দাদু কিন্তু কুলপি খাবে, তুমি পরে কুলপির জন্য কান্নাকাটি করতে পারবে না। পারিসার একই কথা আমি কাপ খাব। গাড়িতে বসে কাগজের রায়পার খুলে যেই কুলপি মুখে দিয়েছি অমনি পারিসা বলে উঠল, মা আমি কাপ খাব না, কুলপি খাব। কিন্তু সেটা তো আর হবার নয়। নাহিদের কড়া হুকুম, যাকে যেটা কিনে দেয়া হয়েছে সেটাই তাকে খেতে হবে। বুরলাম বদলে নেবার উপায় নেই। পারিসা জোরে জোরে চামচ দিয়ে কাপ থেকে আইসক্রিম ভুলে খাচ্ছে। মনের রাগ আইসক্রিমের ওপর তুলে নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে আইসক্রিম ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়ছে। আমার গায়ে এবং আশে পাশে আইসক্রিম সব টিস্যু দিয়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। পারিসার খাওয়া শেষ। এবার আস্তে ফিস ফিস করে পারিসা আমাকে বলল, দাদু আমি কুলপি খাব। এরপর সব চুপচাপ, কোনো কথা নেই। কনক গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প করছিল। হঠাৎ ওর মনে হল আমি বোধ হয় ওর কথা ঠিকমত শুনছি না। কি ব্যাপার, আশা তুমি আমার কথা শুনছ না, কনক জিজ্ঞেস করল। ধরা পড়ে গেলাম, আস্তে আস্তে বললাম, আসলে আমরা কুলপি খাওয়ায় ব্যস্ত সেজন্য তোমার কথা খেয়াল করে শুনতে পারিনি।

আমাদের বড়ো মেয়ে কাস্তা জেসমিন ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সাক্রামাটোতে থাকে। কাস্তাৰ বিয়ে হয়েছে বছরখানেক হল। ওর স্বামী আমিনুর রহমান, ডাক নাম জুয়েল, বুয়েট থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্রাজুয়েট। এরপর টেক্সাসের আলিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে একই বিষয়ে এম. এস. করে এখন ইন্টেল-য়ে চাকুরিরত, পোস্টং ক্যালিফোর্নিয়াতে। ছুটি শেষ বলে বিয়ের মাঝে নুদিন পরেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল, কাস্তা ভিসা এবং অম্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে একাই ক্যালিফোর্নিয়া গেল প্রায় মাসখানেক পর। কাস্তা বুয়েট থেকে আর্কিটেকচারে গ্রাজুয়েশন করেছে। আমেরিকায় পড়তে যাবার প্রস্তুতি তার আগে থেকেই ছিল, ইতিমধ্যে GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় ভাল স্কোর করে আমেরিকায় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন করেছিল, ভর্তির বিষয় প্রক্রিয়াধীন ছিল। এসকল বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো উৎসাহ ছিল কনকের, সে দায়িত্ব

নিয়ে এবং উৎসাহ দিয়ে কাত্তাকে এ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে কাত্তার এ বিয়ের ব্যাপারটিও ছিল প্রধানত কনকেরই সিন্দিকেট, তা না হলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে হয়ত সমস্যা হয়ে যেত। কনক নিজে এসএসিসি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ছিল, ছোটো ভাইবেনদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বরাবরই তার আগ্রহ প্রচুর। কাত্তার উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে কনকের খুব উৎসাহ ছিল, এর সঙ্গে জুয়েলের বিপুল উৎসাহ নতুন করে খুঁত হয়ে কাত্তার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ উন্নত করে দিল। কাত্তা এখন ক্যালিফোর্নিয়া টেক ইউনিভার্সিটি সাক্রামাণ্টো সংক্ষেপে CSUS-য়ে এম. এস. এর ছাত্রী। তার ডিগ্রীর নাম হল এমএসবিএ পুরো কথাটি হল মার্টস অফ সাইস ইন বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মেজর ইন এম. আই. এস. অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। এম. আই. এস.-এর কারণে কাত্তার এ ডিগ্রী হবে এমএসবিএ, তা না হলে এটা হত সরাসরি এমবিএ ডিগ্রী। লেখাপড়ার ব্যাপারে কাত্তার আগ্রহ অনেক, কাত্তার নতুন একাডেমিক কেরিয়ার এর সূচনা হল এখান থেকে।

কাত্তার বাসায় বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম আগেই তৈরী করা ছিল। কনক আমেরিকান এয়ারলাইন্স এর টিকেট কিনে রেখেছিল। বাইশ ফেরুয়ারি দুপুর বারোটায় আমার ফ্লাইট। প্রথমে অস্টিন থেকে ডালাস, সেখানে দুই ঘণ্টা যাতাবিপ্রতি, তারপর একই এয়ারলাইন্স এর অন্য ফ্লাইটে ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামাণ্টো। কনকের বাসা থেকে অস্টিন বিমানবন্দরে যেতে লাগে এক ঘণ্টা। আমেরিকায় আসার পর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে সকলেই সময় দিয়ে দুরুত্ব মাপে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার বাসা কতদূর, সে উত্তরে বলবে এখান থেকে এক ঘণ্টার বা আধা ঘণ্টার পথ। খুব কাছে যারা থেকে তারা বলবে দশ বা পাঁচ মিনিটের পথ। যখন জানতে চেয়েছি অস্টিন থেকে ডালাস কতদূর, উত্তর পেয়েছি তিন ঘণ্টার পথ। এটা পায়ে হাঁটার পথ নয়, গাড়ির পথের সময়, ড্রাইভওয়ের সময়। সকলেই এভাবে উত্তর দেয়, তার ফলে কোন জায়গার দুরুত্ব কত মাইল বা কিলোমিটার দিয়ে আমি বলতে পারব না। আমরা বাসা থেকে রওয়ানা হব সকাল দশটায়। এখন বাজে আটটা। হাতে অনেক সময় আছে, তাহাড়া গতকাল রাতেই সব গোছগাছ করে রেখেছি। আজ আবার কনকদের হাউজিং কম্প্লেক্সে গেরেজ সেল শুরু হয়েছে। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে। হাউজিং সোসাইটির অফিস থেকে দুই সপ্তাহ আগে ভাড়াটিয়াদের নোটিশ দেয়া হয়েছিল যে তোমরা যারা সেল দিতে চাও তারা বাইশ ফেরুয়ারি সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের গেরেজে বসতে পার। আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালিরা সাধারণত জিনিসপত্র কিনি লাইফ টাইমের জন্য। কোনো জিনিস ভেঙ্গে না গেলে বা ছিঁড়ে না গেলে তা ব্যবহার করতেই থাকি। কিন্তু এখানে সকলেই ফ্যাশন বা চল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জিনিস পাঠে নেয়। অন্যত্র কোথাও বদল হয়ে গেলে ভারী জিনিসপত্র সঙ্গে বহন না করে বিক্রি করে দেয়। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন জিনিস কিনে নেয়। কেউ কেউ ঘরে প্রয়োজনের বেশি জিনিস থাকলেও তা বিক্রি করে দেয়। নাহিন আর আমি ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখছিলাম। একটি গেরেজের সামনে এসে দেখি অল্পবয়সী একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বসে আছে বেশ ভালো ভালো আসবাবপত্র নিয়ে। তারা নিজেরাই বলল যে তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন নতুন জিনিসপত্র দিয়ে সংসার সাজিয়েছে। তাদের দুজনের ব্যবহৃত পুরানো জিনিসপত্র সব

বিক্রি করে দিচ্ছে। এখানে খুব সুন্দর কারভকাজ করা দামী কাঠের বড়ো কাবার্ড দেখলাম, দাম লেখা আছে একশো ইউএস ডলার। এটা বেশ বড়ো এবং দেখতে এত সুন্দর যে সেই মুহূর্তে মনে হল নিজের জন্য কিনে ফেলি। নাহিনের মন্তব্য হল দোকানে এটা চারশো ডলারের কম হবে না। ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। মনে হল কোনো মিনাবাজারে এসেছি। একটি গেরেজের সামনে এসে দেখি, স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে মহাব্যস্ত। এখানে জিনিসের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সবগুলোই ঘরে সংসারের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যে জিনিসের গায়েই হাত দিই সেটার গায়েই দেখি লেখা সোল্ড। অবাক হলাম এই এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় পাঁচাত্তর ভাগ জিনিস বিক্রি হয়ে গেছে। নাহিন হেসে ভদ্রমহিলাকে বলল, ইউ আর লাকি। এখানে যেসব জিনিস বিক্রি হচ্ছে সেরকম কয়েকটি জিনিস কনকদের গেরেজে দেখলাম পড়ে আছে। নতুন বাসায় আসার সময় কনকরা অনেক জিনিস হোমেলসেদের দিয়ে এসেছে, ছোটো খাটো জিনিস পুরানো বাসাতেই রেখে এসেছে শুলাম। এখানে আরো লক্ষ্য করলাম, আমেরিকানরা খুবই হিসেবী। অপচয় পসন্দ করে না, কাউকে কিছু দান করতে গেলেও নিজের হিসেব ভালোমত চিন্তা করে তারপর দান করে।

ঠিক দশটায় আমরা অস্টিন বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। দেশে আমরা যেমন বাসে চলাফেরা করি আমেরিকার লোকজনের কাছে প্লেনে চলাফেরা অনেকটা সেরকমই। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে টিকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ডোমেষ্টিক ফ্লাইটে আগে থেকে বুকিং না দিয়ে রাখলে সহজে টিকেট পাওয়া যায় না। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে আমি যদি আমার সিডিউল বদলাতে চাই তাহলে সেকারণে আমাকে কোনো অতিরিক্ত ডলার দিতে হবে না। কিন্তু ডোমেষ্টিক ফ্লাইটে যদি আমি আমার সিডিউল এগিয়ে নিতে কিংবা পিছিয়ে দিতে চাই তাহলে আমাকে একশো ডলার অতিরিক্ত দিতে হবে, একে দণ্ড দেয়া বলা যায়। আরো একটি মজার ব্যাপার হল যদি কারো এক টেক্ট থেকে অন্য কোনো টেক্টে যাওয়া খুব জরুরী হয়ে পড়ে অথচ নির্দিষ্ট ফ্লাইটে টিকেট পাওয়া যায়নি তখন সে ফ্লাইটের যাত্রীদের কাছে সে এয়ারলাইন্স-এর নিজস্ব কাউন্টার থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয়। যদি কোনো যাত্রীর অসুবিধা না থাকে তাহলে তিনি তার টিকেট বদলে নিয়ে পরবর্তী যে কোনো ফ্লাইটে যেতে পারেন। এজন্য মূল টিকেটধারীকে একশো বা দুশো ডলার বোনাস দেয়া হবে। এরপ ব্যবস্থার ফলে দুই পক্ষেই লাভ হয়। যার জরুরী প্রয়োজন তিনি সময়মত টিকেট পেলেন যার সেভাবে জরুরী প্রয়োজন নেই তিনি নতুন সিডিউলে টিকেটের সঙ্গে এক্সট্রা বেশ কিছু ডলার বোনাস হিসাবে পেয়ে গেলেন। কনক বলল কিছুদিন আগে তার একজন সহকর্মী এভাবে নাকি কয়েক শত ডলার বোনাস অর্জন করেছিল। আমি মনে মনে মেলাতে চেষ্টা করলাম, আমরা কি এখনো এতটা কমার্শিয়াল হয়ে উঠতে পেরেছি? আমার সেরুপ মনে হল না। কনক বলল, আগে এখানে কাউকে বিসিভ বা সি-অফ করতে গেলে একেবারে লাউঞ্জের ভেতরে টানেলের গেইট পর্যন্ত যেতে দিত। এগারো সেকেণ্টেরের ঘটনার পর থেকে সে সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেবল যাত্রী ছাড়া আর কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না। আমার স্যুটকেসটা কনক লাগেজ কাউন্টারে পাঠিয়ে দিল, তারপর যাত্রী কাউন্টারে আমার পাসপোর্ট আর টিকেট দেখিয়ে আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম। কনকরা বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল। এরপর আমার কোট হাত ব্যাগ পাসপোর্ট এবং

এমন কি পায়ের জুতা পর্যন্ত খুলে মেটাল ডিটেক্টরের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে দিল। আমাকে দুই হাত দুই দিক ছড়িয়ে দাঁড় করিয়ে তালো করে চেক করল। বুঝতে পারলাম আমেরিকার ভেতরেই সতর্কতা সবচেয়ে বেশি। চেক করে সঙ্গে হবার পর একে একে আমার জিনিসগুলো আমাকে ফেরত দিল। সামনেই একটি সোফা দেখে সেখানে বসে জুতাটা পরে নিলাম। আমার পাশেই একজন সাদা মহিলা তার বুট জুতা পরছিল। আমাকেও জুতা পরতে দেখে একটু বিরক্ত হয়ে বলল তোমার জুতাটাও খুলেছে? আসলে আমার পায়ে ছিল স্যান্ডেল, এ স্যান্ডেল খুলে চেক করার কি আছে সেটা তার কাছে অবাক লেগেছে। এখন বিমানবন্দরে এত কড়াকড়িতে অনভ্যন্ত আমেরিকানদের কাছে এগলো বিরক্তিকরই বটে।

প্লেন অস্টিন থেকে ডালাস যেতে সময় লাগে মাত্র চাল্লিশ মিনিট। এখন প্রায় মধ্যদিন, প্লেনের জানালা দিয়ে ডালাস শহরটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছিল। অস্টিন থেকে ডালাসে গাড়ি করে দুইবার এসেছি। ডালাসের অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার কাছে অস্টিনকেই বেশি সুন্দর মনে হয়েছে। ডালাস শহর হয়ত একটু রুক্ষাত, আসলে অস্টিন শহরটা শ্যামল সুন্দর গাছ পালা ধেরা, ডালাসে সেভাবে নয়। ডালাস অনেক বড়ো শহর, এখানে জনসংখ্যাত অনেক বেশি, অস্টিনের মত নিরিবিলি এবং নৈসর্গিক নয়। প্লেন থেকেও ডালাসকে রুক্ষাত মনে হল, শুধু ঘরবাড়ি আর রাস্তা, সবুজের ছোয়া কমই।

ডালাস বিমানবন্দরে আমাকে টার্মিনাল বদল করতে হয়নি। টার্মিনাল সি-টায়েনটি নাইম গেইটে আমাদের প্লেন নেমেছে। আমার পরিবর্তী ফ্লাইট ধরতে আমাকে সি-সিঙ্ক্র গেইটে যেতে হবে। হাতে দুই ঘণ্টা সময় আছে। আমি আস্টে ধীরে হেঁটে সি-সিঙ্ক্র গেইটের লাউঞ্জে এসে পৌছালাম। বোর্ডিং পাশ-য়ে গেইট নম্বর লেখা থাকলেও প্রায় সময়েই এ নম্বর নানা কারণে বদলে যায়। প্লেন নামার আগেই যাত্রীদের এ পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দেয়া হয়। আমার গেইট নম্বর ছিল সি-সিঙ্ক্র, সেটা পরিবর্তন করে সি-সিঙ্ক্রিন করা হয়েছে। প্লেনের ভেতর ঘোষণা আমি শুনেছি কিন্তু কখন যে আমার নির্দিষ্ট গেইট নম্বরটা বলেছে সেটা খেয়াল করিনি। হাতে ঘণ্টা দূরেক সময় আছে সেই আনন্দে আস্টে ধীরে উন্নতিশ নম্বর গেইট থেকে কাউন্টারটাইন করতে করতে ঘোলো নম্বর গেইট পার হয়ে ছয় নম্বর গেইটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। একা একা ভ্রমণ করছি আমি, একটি কাজ সব সময় করতাম, হাতে বোর্ডিং পাশ থাকলেও নির্দিষ্ট গেইটের সামনে এসে বোর্ডিং পাশ দেখিয়ে কাউন্টারে জিজাসা করতাম, দেখতো আমি সঠিক জায়গায় এসেছি কিনা। এখানে ছয় নম্বর কাউন্টারেও জিজাসা করলাম একই কথা। কাউন্টারে ডিউটিরিত মেয়েটি কম্পিউটারে সব কিছু চেক করে আমাকে উত্তর করল, না তুমি ঘোলো নম্বর গেইটে যাও। তার মানে যতদূর পার করে এসেছি এখন আবার তার অর্ধেক পথ পেছনে যেতে হবে। এবার আর আস্টে ধীরে নয় দ্রুত পা চালিয়ে ঘোলো নম্বর গেইটে এসে পৌছালাম। কাউন্টারে জিজাসা করে নিশ্চিত হবার পর লাউঞ্জে সোফায় এসে বসলাম। সেই সকাল দশটায় বাসা থেকে বের হয়েছিল তার ওপর অনেক হাটাহাটি করে বেশ ক্লান্ট লাগছে। শুধুও পেয়েছে। প্লেনে শুধু একটি কোক দিয়েছে মনে হয় সে কারণে শুধু আরো বেড়ে গেছে। নাহিদ বলে দিয়েছিল বিমানবন্দরের ভেতরের বেট্রেইনগুলো থেকে ফিসবার্গার কিনে থেতে। মাথসের কোনো খাবার থেতে নিয়ে করেছিল কারণ হারাম হালালের একটি ব্যাপার আছে।

সামনেই চিলিস-য়ে গিয়ে বললাম, আমি এখানে বার্গার পেতে পারিঃ ওরা জানাল এখানে বার্গার পাবে না, ম্যাকডোনাল্ডসে খোঁজ কর। আশে পাশে ম্যাকডোনাল্ডস চোখে পড়ল না। বেশি দূরে যেতেও সাহস হল না। একটি পেপসি কিনে নিলাম, সঙ্গে কিছু বিস্কুট ছিল এগুলো খেয়ে নিলাম। চুপচাপ বসে এদিক তাকিয়ে দেখি কত মানুষ যাওয়া আসা করছে। এত মানুষ কিন্তু কোথাও কোনো বিশ্বাস্য নেই। প্রায় সকলেই কথা বলছে কিন্তু কোলাহল যাকে বলে তা নেই। আমার পাশেই একজন আমেরিকান মহিলা শুকনো মুখে বসে আছে। আমি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে নিলাম। আস্টে আস্টে আমাদের সম্পর্কের দূরত্ব যখন অনেকবারি কমল তখন জানলাম ডালাসে তার মেয়ের বাসায় এক সংগ্রহের জন্য মহিলা বেড়াতে এসেছিল। এখন আবার নিজের বাসা সাক্ষাত্কোতে ফিরে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে খুব আগ্রহ দেখাল। ভালো ইংরেজি আমি জানি বলে আমার মনে হয় না, কেবল নিজেকে প্রকাশ করতে পারি। আমি বিদেশী হিসাবে তার কাছে এটাই হয়ত ভালো ইংরেজি বলে মনে হয়ে থাকতে পারে। মহিলা জিজাসা করল, তুমি কি বাংলাদেশেই এত ভালো ইংরেজি শিখেছ? আমি হেসে মাথা নাড়ালাম। ছেলের বাসায় বেড়াতে এসেছি, সেখান থেকে মেয়ের বাসায় এখন যাচ্ছ শুনে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, তোমার কি কোনো ধ্যান্ত চিজ্জেন আছে? হ্যাঁ আছে, আমি উভর নিলাম। দেখলাম মহিলার ঢোঁট দুটো কাঁপছে, আমার উভর শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে আমার কাছে সব কিছু পরিকার হয়ে গেল কেন মহিলা শুকনো মুখে বসে আছে। মেয়ের ঘরে তার একটি নাতনী আছে সেই নাতনীকে ছেড়ে যেতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অস্টিন বিমানবন্দরে কনক আর নাহিদের মাঝখনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেটো মুখ। গোলাপী জ্যাকেট পরা, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। সে ঠিক বুঝতে পারছে না আমি ওদের রেখে কোথায় যাচ্ছি। আমি কি দুর্বল হয়ে পড়ছি পরিসার জন্য? আমি তো সাক্ষাত্কোতে থেকে আবার অস্টিনে ফিরে আসব, তাও বুকের ভেতরে যাবাক করছে কেন? এরপর যখন বাংলাদেশে চলে যাব তখন কি হবে, আমি কি করব? আমি প্রসঙ্গ বদলে জিজাসা করলাম, আমার টিকেট হচ্ছে গ্রুপ ডি, তোমার? তার গ্রুপ বি। একক্ষণ খেয়াল করিন আমাদের পাশে কখন আরেকজন সাদা আমেরিকান মহিলা এসে বসেছে। আমার টিকেট গ্রুপ ডি শুনে নতুন মহিলা বলল, তুমি আমার সঙ্গে থাক আমার টিকেটও গ্রুপ ডি। এখানে আসার পর একটি জিনিস লক্ষ্য করছি, এখানকার লোকজন কাউকে সাহায্য করার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। এরকম অনেকবার ঘটেছে যে কোনো শপিংমলে চুক্তে যাব তখন হয়ত একজন কেউ বের হয়ে আসছে, সে মহিলা বা পুরুষ যেই হোক দরজাটা খুলে আমাকে চুক্তে সাহায্য করছে। ডালাস বিমানবন্দরে এ মহিলা আমাকে নিজে থেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। প্লেন ছাড়তে কোনো কারণে আধা ঘণ্টা দেরী হল। আমরা তিনজন মহিলা গল্প করছি। আমাদের দেশে একটি কথা আছে, আমি কমলী ছাড়তে চাইলে কি হবে কমলী তো আমাকে ছাড়ে না। আমাদের হল সেরুপ অবস্থা। আমি গল্পের প্রসঙ্গ বদলে নিতে চাইলে কি হবে, নতুন মহিলা আরো জোরেশোরে প্রসঙ্গ ধরে রাখল। মহিলা সান এন্টেনিয়াতে এক সংগ্রহের জন্য মেয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। মেয়ের ঘরে তারও একজন নাতনী আছে, বয়স চার বছর। সেই নাতনীকে পেছনে রেখে যেতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলাম আমরা তিনজন কি করে একত্রিত হলাম তার কোনো উভর নেই, সাদা

কালো বা বাদামী যে রঙেরই হোক সব দাদী নানীর বুকের মধ্যে একই আনন্দ, আবার কষ্টও একই। আমার মার কথা, আসলের চেয়ে সুন্দর দাম বেশি একথা কি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? আসলে ভালোবাসার নিকট, মায়া মহত্ব নিকট জাতি বিচার নেই, হৃদয়ের রঙ সবখানেই এক রকমের। তার চলে আসার সময় নাতনী নাকি খুব কান্নাকাটি করছিল সেকারণে মেয়েকে নাকি সে বলেছিল নাতনীকে সামনে থেকে সরিয়ে নিতে। সেরকমই সে বলল। তার খুব খারাপ লাগছে, বুকে কষ্ট হচ্ছে সেকথাও বলল। আমি দেখলাম কথাগুলো হাসতে হাসতে বললেও তার দুচোখ বেশ ছল ছল করে উঠল।

এবার প্লেনে উঠতে হবে। নতুন ভদ্রমহিলাটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাইনে দাঁড়াল। তার যুক্তি হল টিকেটের এ প্রশ্নিয়ের কোনো কার্যকরতা নেই। সবাই যার যার সীট নম্বর অনুযায়ী বসে, গ্রুপ কোনো কাজেই আসে না। দেখলাম যাত্রীদের অনেকেই কথাটা সমর্থন করল। এবার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে যে মহিলা টিকেট চেক করছিল তার কাছেও একই কথা বলল। একটু রেগে গিয়েই বলল, তোমরা যাত্রীদের এভাবে বিত্রুত কর কেন? বুবালাম মন খারাপ থাকার কারণে মেজাজটাও খারাপ। মহিলা নিজেই আমার সীট খাঁজে আমাকে বসিয়ে দিল। আমি বসলাম ঠিক তার পেছনের সারিতে জানালার পাশের সীটে। আমার পাশের সীটগুলোতে বসেছে একটি আমেরিকান দম্পত্তি। আমার সামনের সীটে ঐ মহিলার পাশে বসেছে একজন কালো আমেরিকান মহিলা, সঙ্গে তার চার বছরের একটি মেয়ে। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি জানালার পাশে বসেছে। কিন্তু ঐ মহিলা মেয়েটির মায়ের কাছে অনুরোধ করে তাকে নিজের পাশের সীটে বসাল। সারা সময় দূজনের মধ্যে প্রচুর গল্প, আশেপাশের যাত্রীরা জেনে গেল মহিলা নাতনীকে ছেড়ে আসছে সেকারণে তার মন খুব খারাপ। এক পর্যায়ে একজন এয়ার হোস্টেস এসে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল, আমরা সবাই মজা করে সেসব গল্প উপভোগ করছিলাম। কানে বাজল, প্লেনের পাইলট ঘোষণা করছে আমরা এখন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। একটু বিস্মিতও হলাম, তাইত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আসার সময় নাহিদ আমাকে বলে দিয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া যাবার পথে প্লেন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে যাবে। ভ্রমণ হেঁচেতু দিনের বেলায় সুতরাং সব কিছু ভালোই দেখা যাবে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। আমার চক্ষুষ্ঠির হয়ে গেল আনন্দে ও বিস্ময়ে, কী অভূতপূর্ব সৌন্দর্য! চারদিকে লাল মাটির পাহাড়ের গা কোনো ধারালো অস্ত দিয়ে মস্ত করে নিয়ে এ শিল্পকর্মগুলো তৈরী করেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফ জমে আছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মাঝখান দিয়ে একটি চওড়া ফিতার মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে একটি নদী, মনে হল স্নোতিস্নো পাহাড়ী নদী। এটা কোন নদী, কি নাম? এন্দীর? অত্যধিক অংশেই পাশের সীটের মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, এ নদীর কি নাম? আমার জিভের ওপর উচ্চারিত হয়ে ফিরতে লাগল পদ্মা মেঘনা যমুনা অথবা কীভুলখোলা। কীভুলখোলা নাম নাটকে সিনেমায় পেয়েছি, বরিশাল যাবার এবং ফেরার পথে এ নদীর সঙ্গে সাঙ্কাণ পরিচয়, ঝংকারময় নাম মনে গেঁথে ছিল। পাশের মহিলাটি জানাল এটা কলোরাডো নদী, বুকের মধ্যে স্পন্দিত হল এর নাম। কিছু নাম মানুষ ভোলে না, কলোরাডো নামটিও ভোলার মত নয়। আমেরিকায় যতদিন ছিলাম এ নামটির শব্দ মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে। আরো কিছু কারণও হয়ত ছিল, কলোরাডো নদী আমি অংশে দেখেছি। কনক এর কথা আমাকে অনেক বলেছে, অত্যন্ত

আংগহের সঙ্গে কলোরাডো নদীর তীরে আমার ছবিও তুলেছিল কনক, কিছু কথা আগেই বলেছি। আমেরিকায় ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্য সে আমাকে উৎসাহিত করেছিল। এ বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমার হাতে কাগজ কলম উঠিয়ে দিয়েছিল। কলোরাডো নদীর নাম শুনেই আমার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ার কথা, সেভাবে হয়েও ছিলাম। এখানকার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি, কলোরাডো নদী, কলোরাডো আমার মনে সত্যিই গুজ্জন তুলল। এ নদীর শুরু কোথায় অথবা কোথায় এর শেষ তা আমি জানি না, কেবলই মনে হচ্ছে অংশিনের সঙ্গে একটি সংযোগ গড়ে তুলে কলোরাডো নদী আমার সঙ্গেই, আমার হৃদয়ের একেবারে গভীরেই স্পন্দন সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে নিরস্তর, পদ্মা মেঘনা যমুনা কীভুলখোলার সঙ্গেই। কিভাবে এ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সৃষ্টি হয়েছে তা আমি জানি না। পরে কাস্তার ওখানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওপর তৈরি একটি ডকুমেন্টারী ছবি ডিভিডি প্রেয়ারে দেখলাম। সেখানেও স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না, আমি বুৰুতে পারিনি। পাশে বসা আমেরিকান দম্পত্তিটি যখন শুনল যে আমি এই প্রথম আমেরিকায় এসেছি তখন তাদের ব্যাগের ভেতর থেকে একটি ম্যাপ বের করে সুন্দরভাবে আমাকে বুৰিয়ে দিল। আমাকে দেখাল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের অবস্থান কোথায়, তারপর দেখাল সন্টলেক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আমি শাড়ি পরিহিত ছিলাম হয়ত সেকারণেই জানতে চাইল আমি ইভিয়ান কিনা। বাংলাদেশী শুনে বলল ওহ ইয়েস ইয়েস, তোমাদের লিবারেশন ওয়ার সম্পর্কে আমরা জানি। তোমরা অনেক কষ্ট করেছ, দেখ এখন আবার চারদিকে কি অবস্থা শুরু হয়েছে। ইয়েস, বলে তারপর আমরা অন্য কথায় চলে এলাম।

ছয়.

প্লেন এসে সাক্রান্তে বিমানবন্দরে নামল সংক্ষ্যা সাড়ে সাতটায়। সামনে বসা সেই মহিলা বাচ্চা মেয়েটিকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল তোমার কারপে কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার নাতনীকে ভুলে ছিলাম, তুমি আমাকে খুব হেলেপ করেছে। এরপর আমাকে বলল, আশা করি তোমার মেয়ে তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করেছে। এ বিমানবন্দরটি বেশ ছেটো তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে বের হয়ে এলাম। এক্সেলেটের দিয়ে নীচে নেমে দেখি সামনেই কাস্তা দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনে জুলেল। এক বছর পরে বিদেশের মাটিতে ভিন্ন পরিবেশে কাস্তাকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম তা ঠিক। কাস্তা আমাকে সর্তক করে দিয়ে বলল, সকলের সামনে কান্নাকাটি করবে না। তার কথা শুনে কান্না ভুলে আমি হেসে উঠলাম। ওদের দুজনকে হাসিমুখে দেখে আমার মনটা একেবারে ভরে গেল। শরীর বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কাস্তাদের বাসায় এসে পৌছাতে পৌছাতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এখন রাত তার ওপর ক্লান্ত শরীর, কোনোদিকে ঠিক ভালো করে লক্ষ্য করিনি। তবু অনুভব করলাম সবখানেই ছিমছাম শাস্ত পরিবেশ। খোলা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ঠাস্তা বাতাস

কলোরাডো নদীর তীরে

গায়ে এসে লাগছিল। গরম পানিতে গোসল করে নামাজ পড়ে নিলাম। শরীরের ক্লান্তি অনেকখানি দূর হল। সারাদিন পর খাবার টেবিলে গরম ভাত দেখে ক্ষুধা অনেক বেড়ে গেল বলে অনুভব করলাম। খাওয়া দাওয়ার পর কান্তা ও জুয়েলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে শুয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে, উঠে দেখি সব কিছু সকালের রোদে ঝলমল করছে। কান্তা ভোর বেলায় কখন আমার পাশে এসে শুয়েছে টের পাইনি। কান্তাকে দেখে সেই মুহূর্তে তার ছোটোবেলাকার এবং ঠিক ছোটো পারিসার মতই মনে হল।

আজ রবিবার, ছুটির দিন। সকালে উঠে আস্তে ধীরে প্রস্তুত হতেই বেলা এগারোটা বেজে গেল। দুপুর বারোটার দিকে কান্তা এবং জুয়েল আমাকে সাক্ষামাটো শহরটা সুরে দেখাতে নিয়ে গেল। ক্যালিফোর্নিয়াতে, বিশেষ করে সাক্ষামাটোতে আজ আমার প্রথম দিন। কনকরা থাকে টেক্সাসের রাজধানী অস্টিনে, কান্তারা থাকে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সাক্ষামাটোতে। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট যেমন খুবই বড়ো এর রাজধানী সাক্ষামাটো সে তুলনায় খুব বড়ো শহর নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার আরেকটি নাম নাকি গোন্ডেন স্টেট। এখানে সোনার খনি আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই আধুনিক ক্যালিফোর্নিয়ার প্রকৃত সাফল্যের শুরু। ক্যালিফোর্নিয়ার সরকারি সীলে লেখা আছে ইউরোপ। এটা সম্ভবত ধীক শব্দ, অর্থ হল আমি পেয়েছি। এ কথাটি প্রকৃতপক্ষে সোনার খনি আবিষ্কারেই ইঙ্গিতবহু। গ্রিজলি বিয়ার ও স্টার খচিত পতাকার লাল রঙ কারেজ বা সাহস এবং সাদা রঙ বিশুদ্ধতার পরিচয় বহন করে। ক্যালিফোর্নিয়ার নিজস্ব রঙ হচ্ছে নীল ও সোনালী। ফুল হচ্ছে গোন্ডেন পপি এবং পশ্চ হল গ্রিজলি বিয়ার। এটা বৃহদাকার হিস্তে ভালুক। আমেরিকার অন্যান্য স্টেটের তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে বেশি সোনা উত্তোলন করা হয়। অস্টিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে দেরা, সাক্ষামাটোর সৌন্দর্য মানুষের হাতে তৈরী। এই এলাকাটা একটু সমতল। কান্তাদের বাসা র্যাফ্তে কর্ডোভা এলাকায়। ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সটি খুব সুন্দর এবং বড়ো এলাকা জুড়ে। রাস্তার উল্টো পাশে উত্তর দিকে অফিস পাড়া। বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে এখানে। বেশির ভাগই হল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী। একেকটি অফিস কমপ্লেক্স বিরাট এলাকা নিয়ে। এখানে কাছাকাছি আরো দুটো হাউজিং কমপ্লেক্স আছে সেগুলোও বেশ বড়ো এলাকা জুড়ে। খুব সুন্দরও। টেক্সাসে যেমন দেখেছি এখানেও প্রায় একই রকম দেখলাম, আবাসিক ঘরবাড়ির চেহারা ধ্রায় একই ধরনের দেখতে। সব কাঠের বাড়ি, ছাদগুলো আমাদের দেশের দোচালা টিনের ঘরের মত। তবে অফিস বিল্ডিংগুলো সব কংক্রিটের, ছাদগুলো ঢালাই করা সমতল। ডাউনটাউনের বড়ো বড়ো সুউচ বিল্ডিংগুলোর নির্মাণ কৌশল অনেকখানি পৃথক, অন্য ধরনের। আবাসিক বাড়িগুলো একতলা থেকে চারতলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অফিস বিল্ডিংগুলো আটতলা দশতলা বা তার ওপরেও আছে।

পুরো টেক্সাসের সৌন্দর্য অনেকটা প্রাকৃতিকভাবেই। সেখানে শীতকালে প্রায় সব গাছের পাতা ঝরে যায়। ফুল পাতাবিহীন ন্যাড়া গাছগুলো যেন হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘাসগুলো ধূসুর হয়ে আছে, যেন রোগশয়্যায়। কোথাও একটি বুনো ফুল পর্যন্ত দেখা যায় না। শুধু দুয়েকটি বিশেষ জায়গায় ফুল দেখেছি, ডালাসের ডাউনটাউনের কাছেই একটি ফুলের ঘড়ি আছে, এখানকার ফুল কোনো কৃত্রিম নয়। নানা রকমের সুন্দর ফুল দিয়ে এ

কলোরাডো নদীর তীরে

ঘড়িটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কিছু অফিস বা বাড়ির সামনে ফুল দেখেছি। সাক্ষামাটোর চারদিকে সবুজ। রাস্তার দুপাশে সবুজ ঘাস মসৃণ করে ছাটা। এখানে গাছগুলো এমনভাবে লাগানো যে বছরের সব ঋতুতেই কোনো না কোনো গাছে ফুল পাতা থাকবেই। সব সময়েই লনগুলোতে রাস্তার পাশে নানা রঙের ফুলের সমাহার। ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন এলাম এখানে তখন বসন্তের কেবল শুরু। দেখে এসেছিলাম, অস্টিনে ঘাসগুলোতে সবুজের রঙ ধরতে বাকি, ন্যাড়া গাছে পাতার দেখা ছিল না। কেবল দুয়েক ধরনের গাছে ফুলের কলি উকি দিছিল। সাক্ষামাটোতে ঋতুবদল আরো এগিয়ে এসেছে, এখানে দেখলাম চারদিকে সবুজের সমারোহ। একটি গাছ তখনো ন্যাড়া, সবুজ পাতার অপেক্ষায়, অন্য গাছটিতে ফুল বুম বুম করছে। রাস্তার দুপাশে সবুজ ঘাসের ভেতর দিয়ে লাল বেগুনী কমলা হলুদ নানান রঙের ফুল জোরে উকি দিছে, ঝলমল করে উঠবে এক আধ দিন পরেই। সাক্ষামাটো রাজধানী হলেও বেশ নিরবিলি, নিসর্গের মৌনতা ও সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা। শহরটি ছিমাম, ঠিক রাজধানী হিসাবে তাক লাগিয়ে দেবার মত বড়ো নয়। কান্তাদের বাসা অফিস পাড়ার বেশ নিকটে সেকারণে পায়ে হেঁটে চলাচল করছে এমন লোকজন সব সময় চোখে পড়ে। জুয়েল কান্তা আমি ফলসম লেক দেখতে গেলাম, জুয়েল আমাদের নিয়ে গেল। খুবই সুন্দর এবং বড়ো লেক, গভীর পানির রঙ নীল। গাড়ি থেকে নেমে একেবারে পানির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দর্শনর্থী অনেক তবে অধিকাংশ সিনিয়র সিটিজেন, বার্দকের ভাতার এসেছে যাদের ওপর এখানে তাদের সম্মান করে সিনিয়র সিটিজেন বলা হয়। চট্টগ্রামে ফয়স লেক দেখেছি কিন্তু এ ফলসম লেক তার চেয়ে অনেক বড়ো। বেশ জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, বেশিক্ষণ থাকা গেল না, তাই ফিরতে হল। বাসায় ফেরার পথে কাবুল নামে একটি দোকানে গেলাম। এ দোকানের মালিক মুসলিমান, কান্তারা মাছ মাংস এখান থেকেই কেনে। বেশ কয়েকটি দোকান আশেপাশে আছে। পার্কিংলট ঘিরে সুন্দর ফুলের বাগান। অফিস দোকান পাট সবখানেই চমৎকার সব বাগান, সেখানে নানা রঙের ফোটা ফুল ছেরে আছে। যাবার পথে রাস্তার পাশে দেখি তিনি চারজন ছেলেমেয়ে একটি প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাকার্ডে লেখা, একজন ক্যান্সার রোগীর সাহায্যের জন্য তোমার আমাদের কাছে চুল কাটিয়ে যাও। বুঝতে পারলাম ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার যে খরচ লাগবে তা জোগাড় করার জন্য ওরা এভাবে চুল কাটার ব্যবস্থা করেছে। কোনো কিছু প্রচার করতে হলে এভাবে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা দাঁড়ায়। আরো একটি মজার ব্যাপার হল প্ল্যাকার্ড হাতে ডিক্ষা করা, আমাদের দেশে ভিক্ষুকদের এভাবে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানোর রেওয়াজ এখনো নেই।

কান্তাদের বাসার উল্টোদিকেই অফিস পাড়া, রাস্তার দুপাশের ফুটপাত দিয়ে অনেক লোকজন পায়ে হেঁটে চলাচল করে। বেলা এগারোটার দিকে অথবা লাঞ্চ ব্রেকের সময় দেখা যায় তিনজন চারজন বা পাঁচজনের হোটো হোটো গ্রুপ আশেপাশের রেস্টুরেন্টে কফি খেতে বা লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে অথবা হায়ত খেয়ে ফিরছে। কান্তা আর আমি রোজই কাছে কিনারে হাঁটতে বের হতাম। আমাদের দেশে ফুটপাতগুলো হকারদের দখলে কিংবা পাশের দোকানীদের দখলে। বড়ো রাস্তার চেয়ে ফুটপাতে হাঁটার সময়েই এখানে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, নোংরা ময়লা আবর্জনা খানাখন্দ ম্যানহোলে বিপদের ঝুঁকি

তো আছেই। সাক্রামাটোতে এবং অন্যত্র দেখলাম ফুটপাত সম্পূর্ণভাবে পথচারীদের, নির্ভয়ে গল্ল করতে করতে হাঁটছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত তবু পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় প্রায়ই কেউ একটু হাসি দিয়ে বলবে, হাই, হ্যাত এ নাইস ডে।

একদিন পায়চারী করতে করতে চলে গেলাম আধা মাইল দূরে, ওয়াল মার্ট মল-য়ে। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা, যাকে বলে উইঙ্গেল শপিং। এভাবেই আরেক দিন গেলাম ইন্ডিয়া বাজার নামে একটি ইন্ডিয়ান দোকানে। সব জিনিসই ভারতীয়, সেখানকার তৈরি। হিন্দী সিনেমার ক্যাস্টে ছাড়াও হিন্দী টিভি সিরিয়ালগুলোর ক্যাস্টে পাওয়া যায়। তখন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডকাপ খেলা চলছিল। একদিনের খেলার ভিডিও ক্যাস্টে দুই ডলারে ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। এ ক্যাস্টে দুই দিন রাখা যায় তারপর ফেরত দিতে হয়। এখান থেকে বেড ইট লাইক বেথাম এবং হলিউড বলিউড নামে ইন্ডিয়ান পরিচালকের তৈরী ইংরেজি ছবির ক্যাস্ট নিলাম। অস্টিনে ডালাসে ও হিউস্টনে বাংলাদেশী দোকান আছে কিন্তু সাক্রামাটোতে কোনো বাংলাদেশী দোকান নেই। এখানকার বাংলাদেশীরা কখনো লস এঞ্জেলিস, সানফ্রান্সিসকো বা নিউইয়র্কে বেড়াতে গেলে সেখানে বাংলাদেশী দোকান থেকে বাংলাদেশের নাটকের ক্যাস্ট কিনে নিয়ে আসে। এখন বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল অনেকগুলো, সেজন্য বাংলা নাটকের সংখ্যাও অনেক। জুয়েলের বন্ধু বাদলের কাছে বাংলা নাটক অনেক আছে। এগুলো সবই ক্যাস্টে উঠানো। মজার ব্যাপার হল আমি রোজার সৈদের পরই আমেরিকায় এসেছি, কাস্তার বাসায় বসে সৈদের নাটক এবং ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলো দেখলাম।

আজ ডাউনটাউন বেড়াতে যাব, কাস্তার কাছে বাসের টাইমটেবল আছে। কাস্তা বছরখানেক হল আমেরিকায় এসেছে। এই এক বছরে কাস্তা এ নতুন দেশে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে। সে একাই বাসে করে সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারে। এখানকার সব নিয়ম কানুনও সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। মনে মনে একটু হাসলামও। কাস্তা যথেষ্ট স্বাধীনভাবে চলার মত যোগ্যতাসম্পন্ন। বিশেষ করে বুয়েটে অর্কিটেকচারের ছাত্রী এবং এখানকার ছাত্রী হলে আবাসিক ছাত্রী ছিল বলে স্বাধীনভাবে চলার যোগ্যতা এমনিতেই তার অনেকখানি অর্জিত হয়েই ছিল। সব নিজের কাজ সে নিজেই ভালোমত করতে পারত। তারপরেও দূরে কোথাও কিংবা অপরিচিত কোনো জায়গায় যেতে হলে কাস্তা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এখনে এই দূরদেশে আমি নিজেই ওর কাছে শিশু হয়ে গেছি। এতদিন আমি আমার মার বাসায় বেড়াতে গেছি, এখনো যাই। আজ আমি মেয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছি। কেমন দ্রুত সব কিছু বদলে যায়।

কাস্তাদের বাসাটা দোতলা, এমনভাবে তৈরী যে অনেকটা রুবিক্স কিউবের মত মনে হয়। মোট বারোটি ফ্ল্যাট আছে। কাস্তারা থাকে মেইন রোডের দিকে, দোতলায়। ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সের নাম বিশপ ক্লোয়ার। ওদের ফ্ল্যাটের সামনে রাস্তার পাশে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। সেখানেই বড়ো বড়ো করে লেখা আছে বিশপ ক্লোয়ার। আর বাগানের মাঝখানে সুন্দর পানির ফোয়ারা। কাস্তা বলল গত ছয় মাস ধরে পানির ফোয়ারাটা বক্স হয়ে আছে। আমার যাবার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে একদিন দেখলাম কয়েকজন লোক মিলে সারাদিন ধরে খুটখুট করে ফোয়ারাটা চালু করে দিল। ওদের বাসার দোতলার

টেরাস থেকে ফোয়ারাটা দেখতে এত সুন্দর লাগে মনে হয় সারাদিন টেরাসে বসে থাকি। কাস্তা আবার ওদের টেরাসকে সুন্দর ফুলের টব দিয়ে সাজিয়েছে। জুয়েল এবং কাস্তা দুজনেই খুব সিল্পী, কোনো বাহ্যিক বা চাকচিক্য ওদের পদ্মন নয়। নিজেদের সংসার ওরা সেভাবেই গুচ্ছে নিয়েছে। যতদিন ওদের সঙ্গে ছিলাম তারা যখনই সময় পেয়েছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে। আমার দ্রুণগকাহিনী লেখার ইচ্ছা আছে শুনে যেখানেই বেড়াতে গেছি সেখানকার খুটিনাটি সব তথ্য ওরা আমাকে সংহাই করে দিয়েছে। ডাউনটাউনে যাবার বাস নয়টা পনেরো মিনিটে বাসার কাছের ৭৪ নম্বর স্ট্যান্ডে আসবে। এখনে বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড এভাবে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। বাস থেকে ৭৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ড পাঁচ মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ। নয়টাৰ সময় আমরা বাসা থেকে বের হলাম। দুজনে আপ্তে ধীরে গল্ল করতে করতে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক নয়টা পনেরো মিনিটে বাস এল। ড্রাইভারের পাশে রাখা একটি মেটল বক্সে তিন ডলার করে দুজনের ভাড়া মোট ছয় ডলার ফেলে দেয়া হল। ড্রাইভার আমাদের হাতে একটি করে কুপন ধরিয়ে দিল। এই কুপন দিয়ে আমরা সারাদিন যতবার খুশি বাস ও লাইট রেলে যাতায়াত করতে পারব। সুন্দর বাস, সুন্দর সব ব্যবস্থা। আরো দুতিনটি স্টেপেজ থেকে যাত্রী পনেরো মিনিটের মধ্যে লাইট রেল স্টেশনে বাস এসে দাঁড়াল। বাস এবং লাইট রেল একই কোম্পানীর পরিচালিত বলে বাস ও লাইট রেলের সময়সূচির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। বাসে করে রেল স্টেশনে এসে লাইট রেলের জন্য বিশেষণ অপেক্ষা করতে হয় না। আবার রেল থেকে নেমেও নির্দিষ্ট বাসের জন্য বসে থাকতে হয় না। এই লাইট রেল কেবল একটি শহরের মধ্যেই যাতায়াত করে, এতে এক শহর থেকে অন্য শহরে বা এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যাওয়া যায় না। সাক্রামাটোতে যেমন মেথারফিল্ড মিল স্টেশন থেকে রেল ছাড়ে তারপর ছোটো ছোটো স্টেশন পার হয়ে ডাউনটাউনের ভেতর দিয়ে অন্য প্রান্তে ওয়াট আই এইটি স্টেশনে গিয়ে থাকে তেমনি আবার একই পথে ফিরে আসে। এভাবে সারাদিনই চলতে থাকে। এই লম্বা রেলপথে কিছুক্ষণ পর পরই যে স্টেপেজগুলো আছে সেখানে আধা মিনিটেরও কম সময়ের জন্য রেল এসে থামছে, অটোমেটিক দরজা খুলে যাচ্ছে। প্রশংস্ত দরজা দিয়ে যাত্রীরা সব উঠানামা করছে। মেথারফিল্ড মিল স্টেশনে পৌছে দেখি অনেক লোকজন অপেক্ষা করছে। এদের মধ্যে কালো মানুষই বেশি চোখে পড়ল। আমাদের মত এশিয়ানও আছে তবে সাদা লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এখানেই দেখলাম খুবই দরিদ্র কালো আমেরিকানদের। ভেসে পড়া চেহারা আর পোশাক, দেখেই এদের আধিক অবস্থা বোঝা যায়। একজন বৃদ্ধকে দেখলাম ময়লা কাপড়ের পুটলি নিয়ে বসে আছে, পায়ে মোজাবিহান ছেড়া কেডস, গায়ে মলিন লয়া গাউন, শুকনো মুখ। রেল এসে থামল, আমরা চটপট উঠে পড়লাম। ভেতরে বেশ কিছু কালো আমেরিকান ছেলেকে দেখলাম যাদের চেহারা সাজ পোশাক হলিউডের ফাইটিং সিনেমার মাত্তানদের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি সত্ত্ব বলতে কি ওদের দেখে একটু ভয়ও পেলাম। আমার মুখ দেখে চেনেশন অঁচ করতে পেরে কাস্তা আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমা ভয় পেয়েনো। কোনো বিপদে পড়লে দেখা যাবে এ কালো ছেলেগুলোই সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। আর তোমার সামনে হাসি মুখে যে সাদা চামড়ার লোকটি বসে আছে, এগিয়ে আসছে। আর তোমার সামনে হাসি মুখে যে সাদা চামড়ার লোকটি বসে আছে, ইউনিভার্সিটির স্টেপেজে এসে বলা যায় না, সেও একজন ক্রিমিনাল হয়ে থাকতে পারে। ইউনিভার্সিটির স্টেপেজে এসে বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে নেমে গেল। কাঁধে ব্যাগ আর বয়স দেখে অনুমান করলাম এরা

সবাই হয়ত ছাত্র। আমরা নামলাম ডাউনটাউনে। ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই, কেবলই ঘুরে ঘুরে দেখা। রাস্তার দুপাশের ফুটপাথ দিয়ে অনেক লোকজন চলাফেরা করছে। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর একটি খোলা রেস্টুরেন্টে বসে পপকর্ণ আর হট চকোলেট খেলাম। শরীর যেটুকু ঝাল্ল হয়েছিল হট চকোলেট খেয়ে তা দূর হয়ে গেল। এবার অন্য রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে আবার ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের সামনে এলাম। ক্যাপিটল বিল্ডিং হল ক্যালিফোর্নিয়ার গৰ্ভর্ণের সরকারি ভবন। ভেতরটা দেখার জন্য লাইনে এসে দাঁড়ালাম। খুব ভালো করে চেক করে নিয়ে তারপর চুক্তে দিল। মিউজিয়ামটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এখানে আমেরিকানদের বিজয়ের ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। এ বিজয়ের পেছনেও যে অঙ্ককার অনেক আছে মানুষের ক্রন্দন আছে সেসবের ইতিহাস কোথাও বলা হয়নি। পরাজিত হয়েছিল মেস্কিনরা, এ ভূমি এক সময় তাদের ছিল। রক্তাক্ত হাতবদল হয়েছিল সে কথাগুলো এখানে নেই। এবার আমাদের ফেরার পালা। পায়ে হেঁটেই রেল টেশনে এসে অপেক্ষা করছি। চারদিকে অনেক গাছ, ফুলে ফুলে সব ভরে আছে। এসবের মধ্যে একটি কমলা লেবুর গাছ দেখলাম। গাছে পাকা কমলা ভর্তি হয়ে আছে, নীচেও অনেক পাকা কমলা লেবু পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম এ কমলা গাছটি আমাদের দেশে কোনো রাস্তার পাশে হলে কেমন হত? কমলাগুলো এভাবে পড়ে নষ্ট হত না সেকথা ঠিক। তবে গাছটির কি হতে পারত?

গত শনিবার কাস্তার বাসায় এসেছি, আজ আর এক শনিবার। সময় কত দ্রুত পার হয়ে যায়। দুদিন ধরে মনটা কেমন করছে, প্রায় ফেরার সময় হল। হাতে গোনা আর কয়েক দিন পরেই দেশে ফিরতে হবে। শীগলীরই দেশে ফিরে যাব একথা মনে হতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এ কষ্ট কাউকে বোঝাতে পারছিলাম না। এখানে কাস্তা আর জুয়েলকে পেছনে ছেড়ে রেখে যাব, আবার করে কখন ওদের সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। একই প্রশ্ন কলক, পারিসা এবং নাহিদকে নিয়েও। আমার অসুস্থ আশীতিপর মার কথা মনে হতেই একটু দীর্ঘও বোধ করলাম না তা নয়। আমরা সব কয়জন ভাইবোন ঢাকায় থাকি। মার কোনো প্রয়োজন হলে স্টার্টামেনের মধ্যে মার কাছে হাজির হই। কিন্তু আমাদের পরেকার এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এক শহর থেকে অন্য শহরেও নয়, তারা বরং এক দেশ থেকে অন্য দেশে জীবিকার প্রয়োজনে চলে যাচ্ছে। পৃথিবী একাকার হয়ে গেছে, হয়ত ছোটোও হয়ে গেছে। আবার এদের ছেলেমেয়ে যারা এখানে জন্মেছে বা বড়ো হচ্ছে তাদের হয়ত কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ তারা এ পরিবেশের মধ্যেই বেড়ে উঠবে, নিজেদের মা বাবাকেও কাছে পাবে। কিন্তু আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়ত ট্রানজিট ক্যাম্পেও বাস করিছি, ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তাই আমাদের কষ্টটা বেশি। এরপ কষ্ট আমাদের পূর্বেকার প্রজন্মের একেবারেই ছিল না পরবর্তী প্রজন্মের হয়ত থাকবে না, মনে করে নিছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা চায় আমরা ভবিষ্যতে ওদের কাছে গিয়ে থাকি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? একটি বৃক্ষশিখকে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগালে কোনো অসুবিধা হয় না। দিন কয়েক পরেই সে বৃক্ষশিখ স্বাভাবিকভাবে বড়ে হতে থাকে। কিন্তু একটি বয়েসী ফলস্ত গাছকে এভাবে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় লাগালে তা শুকিয়ে যায়, তা আর বাঁচে না। সামনের দিনগুলো ভেবে এরকম হাজারো কথা মনের মধ্যে আসা যাওয়া করে, কোথাও তা শেষ হয় না।

জুয়েল আমাদের লেক তাহে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর মসৃণ আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম। এবার পাহাড়ী এলাকা এবং পাহাড়ী পথের শুরু। রাস্তার দুপাশে পাইন গাছের মত বড়ো বড়ো গাছের বন আর পাহাড়। কোথাও দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। পাহাড়ের কোল ঘেষে তির তির করে পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে। কাস্তা বলল এগুলো নাকি পাহাড়ী নদী, স্রোত বাড়ে কমে। নদীমাত্ত্ব দেশের মানুষ আমরা, এরকম নদী দেখে এগুলোকে নদী বলে দেখে স্থিত হাসিও পেল আমার। গাড়ি খুব জোরে ছুটছে। এবার দেখলাম রাস্তার এক পাশে বড়ো বড়ো পাহাড়, অপর পাশে গিরিখাত। বুরাতে পারলাম অনেক উচ্চতে উঠে এসেছি। রাস্তার পাশে লেখাগুলো দেখে বুঝলাম কয়েক হাজার ফিট ওপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমরা যতই সামনের দিকে এগোচ্ছি চারপাশের পরিবেশ ততই বদলে যাচ্ছে। দূরে উচ্চ উচ্চ পাহাড় দেখা যাচ্ছে, চূড়া বরফে ঢাকা। এবার রাস্তার দুপাশে বরফ দেখতে পেলাম। ঘন্টাদেড়ক একটানা চলার পর রাস্তার পাশে প্রশংস্ত খালি জায়গা দেখে গাড়ি থামানো হল। সেখানে আরো দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, এগুলো আমাদের বেশ আগেই এসেছিল। চারদিকে ভালো করে দেখলাম, দূরে লেক তাহে দেখা যায়। পাহাড়ের কোল ঘেষে সুন্দর মসৃণ পথ, একে বেঁকে চলে গেছে, অনেক দূর। এ রাস্তাগুলো তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো পাথরের পাহাড় কেটে। সামনেই রাস্তার পাশের পাহাড়টার ন্যাড়া শরীর দেখা যাচ্ছে। বড়ো বড়ো কালো পাথরের বলক এমনভাবে বসানো আছে দেখে মনে হয়, যেন কেউ যত্ন করে খাজ কেটে বসিয়ে এটা তৈরি করেছে। এসব কঠিন পাথরের পাহাড় দিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে যারা সুন্দর মসৃণ রাস্তা তৈরি করেছে তারা হয়ত কেউ আর এখন বেঁচে নেই। তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো পেয়েছে এ রাস্তায় চলার আনন্দ, প্রকৃতিকে জয় করে নিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দময় মুহূর্তগুলো।

রাস্তার অপর পাশ ঢালু হয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে। তারও পরে অনেক উচ্চ উচ্চ পাহাড়, সাদা বরফে ঢেকে আছে। পাহাড়ের গায়ে বরফের ভেতর দিয়ে উচ্চ গাছের মাথাগুলো কেবল যেন ভারি হয়ে আছে। এরকম দৃশ্য আমার কাছে একেবারেই নতুন, আগে কখনো দেখিনি। কখনো বই পড়ে জেনেছি, সে জানা এবং আজকের দেখা এক রকমের নয়। কেমন যেন বিস্ময় আর আনন্দের শিহরণ সৃষ্টি হল মনে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, যেন কনকন করছে। গায়ে ফুলভাতা গরম সোয়েটার তার ওপর হৃতসহ জ্যাকেট, হাতে গরম প্লাভস। তার পরেও ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটার শরীরে কাঁপুনি ধরছিল। এক্ষিমোরা এর চেয়েও অনেক বৈরী পরিবেশের মধ্যে বাস করে। তাদের পোশাক আশাক দেখেছি, বুরাতাম না। এক্ষিমোরা আসলে প্রকৃতিরই সত্তান, প্রকৃতি এভাবে তাদের তৈরি করেছে। বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ালাম। লেক তাহে পরিষ্কার দেখে নিয়ে আসা ন্যাড়া নদীর কাছে পাহাড়ের শুরু থাকে। কেবল রাস্তাগুলো পরিষ্কার, লেক কাছে এসে দাঁড়ালাম। চারদিক সাদা বরফে ঢেকে গেছে, কেবল রাস্তাগুলো পরিষ্কার, লেক

তাহে স্থির হয়ে আছে। গভীরতার কারণে পানির রঙের পার্থক্য পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গভীরতা যেখানে বেশি সেখানকার পানির রঙ কালো, যেখানে কম সেখানে পানির রঙ নীল, তীরের দিকে পানির রঙ স্বাভাবিক। লেকের পানির কাছে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু জমাট বাধা বরফের কারণে তীরে নামার সিঁড়ি পিছিল হয়ে ছিল সেজন্য আর সাহস করলাম না। পিছিলতার কারণে পড়ে যদি যাই নিশ্চয়ই হাড় ভাঙবে, দেশে ফেরার সমস্যা হবে। কাছেই একটি উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নেসর্গিক সৌন্দর্য দেখছিলাম। কিছু দূরে পানিতে একটি স্পীড বোট দেখতে পেলাম। বোটটি তীরে এসে ভিড়ল, এক জোড়া নব দম্পতি বোট থেকে নেমে এল। সাদা ফোলানো লম্বা গাউন পরা নব বধূকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করল তার স্পাউজ, আমরা বলি স্বামী। স্পাউজ শব্দ দিয়ে স্বামী স্ত্রীর পার্থক্যকে ঢেকে দেয়া হয়েছে, এটা হ্যাত জেন্টার সচেতনতার অংশ হয়ে থাকতে পারে। সঙ্গে চার পাঁচজন ছেলে যেয়েকেও দেখলাম। আমেরিকার প্রায় সব ষ্টেটেই বিয়ে করতে হলে নাকি পাত্র পাত্রীকে দিন পনেরো আগে অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হয়। অনুমতি মিললে তারপর বিয়ে। কেবল নেভাদা ষ্টেটেই বিয়ের জন্য কোনো অধিম অনুমতি আবশ্যিক হয় না। এই সুবিধার কারণে এখানে বিয়ের ভিড় লেগেই থাকে। অন্যান্য ষ্টেট থেকেও অনেকে এখানে বিয়ে করতে আসে। নেভাদা ষ্টেটের আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে এখনকার ক্যাসিনো। সারা আমেরিকায় জুয়া খেলা নিষিদ্ধ কিন্তু একমাত্র নেভাদাতেই এটা আইনগতভাবে বৈধ। এসকল সুবিধার কারণে এখানে যেমন প্রচুর ক্যাসিনো গড়ে উঠেছে তেমনি ম্যারেজ চ্যাপেলেরও ছড়াচাঢ়ি। ক্যালিফোর্নিয়ার এই প্রান্তে এবং নেভাদায় এখনো বরফ পড়ছে। পাহাড়গুলো আগাগোড়া সব সাদা বরফে ঢেকে আছে। বোধ হয় একারণে ক্ষী অনুরাগীদেরও প্রচুর ভিড় এখানে। রাস্তা ঘাটে প্রচুর লোক চলাচল করতে দেখে ভালোও লাগল।

এবার বাসায় ফিরতে হবে। আসার সময় রাস্তার যে পাশ পাহাড়ের কোল ঘেনে ছিল সেদিক দিয়ে এসেছিলাম। ফেরার পথটি খাদের পাশ দিয়ে। এত জোরে সব গাঢ়ি চলছে যে বেশ ভয় পেয়েছিলাম তা ঠিক। সারা রাস্তা দোয়া পড়তে পড়তে এসেছি। বাসায় ফেরার পর শরীর ঠিক ঝাউত লাগছিল না, অর্থ মনটা কেমন অস্থির মধ্যে। দুদিন আগেও ঢাকার খবর পেয়েছি, সবাই ভালো আছে। বুরুলাম দেশ থেকে এসেছি থায় তিন মাস হল, দেশের জন্য এখন মন খারাপ লাগছে। গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় একটু বসেছি। কাস্তা বেশ বিমর্শভাবে আমার পাশে এসে বসল। ওর মুখটা দেখে কেমন যেন দুঃসংবাদ আশংকা করলাম। সতিই তাই, বেশ বড় দুঃসংবাদ। কাস্তা বলল, আমা তুমি মনটা শক্ত কর একটি খারাপ খবর আছে। ফাতাহ মামা মারা গেছেন। আমি শক্ত বরফের মত হয়ে কাস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

ফাতাহ ভাই আমার খালাতো ভাই। বাংলাদেশ বিমানের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। মাত্র কয়েক মাস আগে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গেছেন। ফাতাহ ভাইয়ের বাসা মিরপুরে, আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মনের দিক দিয়েও তিনি আমাদের খুব কাছাকাছি, সেকারণে তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অত্যন্ত বেশি এবং ঘনিষ্ঠ। কাস্তার বিয়ের মাস দুয়েক পরেই ফাতাহ ভাইয়ের বড়ো মেয়ে চিনার বিয়ে হয়। চিনার স্বামী ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, নাম জাতেদ। আমেরিকার ভার্জিনিয়া স্টেটে চাকুরি

করে, থাকেও এখনে। টিনা এবং কান্তা এক সঙ্গাহ আগে পরে আমেরিকায় এসেছে। ফাতাহ ভাই, তার ছেটো মেয়ে ট্রেন্সা এবং শুলু ভাবীকে নিয়ে আমেরিকায় টিনার বাসায় বেড়াতে আসবেন, সেভাবেই সব ঠিকঠাক হয়েছিল। প্রত্যেক সঙ্গাহেই টিনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হত, আর আমি দিন ঘূর্ণতাম করে তারা আসবে। ফাতাহ ভাই আর কোনোদিনই আসবে না, তার সঙ্গে দেখাও আর কখনো হবে না। এগুলো ভাবতেই মনে হল বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা খুব বেশি দূরে, তেমনি আমেরিকা থেকে অনেক দূরে বাংলাদেশও।

সাত.

কান্তার সঙ্গে ওর ইউনিভার্সিটি দখলে যাব আজ। ইউনিভার্সিটির পুরো নাম ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি সাক্রামান্টো (CSUS) তবে স্থানীয় লোকজন একে স্যাকাটেটও বলে। কান্তা যখন বুয়েটে পড়ত তখন কতবার ওর সঙ্গে বুয়েটে গেছি। ভাবতে একটু অবকাশ লাগছে, আজও ওর সঙ্গে নতুন দেশে ওর নতুন ইউনিভার্সিটি দখলে যাচ্ছি। মা বাবার কাছে ছেলেমেয়েদের সব ব্যাপারই বেশি ইমোশনাল হয়ে দাঁড়ায়। ছোটখাটো জিনিসগুলোও কেমন গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। অঠিনে যখন কনক ওর অফিসে দেখাতে নিয়ে গেল তখন মটোরোলা কোম্পানীর বিশাল বিল্ডিংটা দেখে মনে হল এটা আমারও। এখানে আমার ছেলে চাকুরি করে মনে হতেই বুকটা আনন্দ ও তত্ত্বিতে ভরে গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না কারণ আমার ছেলেমানুষী দেখে সবাই যদি হাসে, তাই। কান্তার ইউনিভার্সিটিতে এসেও আমার মনের অবস্থা একই রকমের। কনক ও কান্তার শৈশবে দুজনের হাত ধরে তাদের স্কুলে নিয়ে যেতাম। আজ কান্তা আমার হাত ধরে ওর ইউনিভার্সিটি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। এই দিন সত্তিই আমার অপরিসীম আনন্দের। সেই বাসে করে লাইট রেল টেক্সেন, তারপর লাইট রেলে করে যাত্রা, আমার জন্য নতুন একটি ভুবন আবিক্ষারের মত, এ ভুবনটি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। লাইট রেল এসে থামল ইউনিভার্সিটি সিরুটি ফাইভ স্ট্রিট স্টপেজে। ইউনিভার্সিটি যাবার নিদিষ্ট বাসটি এখনো এসে পৌছায়নি, মিনিট পাঁচকে অপেক্ষা করতে হবে। বাস এল, এখানে এসে থামতেই যাত্রীরা সবাই নেমে পড়ল কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বাসে উঠতে পারলাম না। ড্রাইভার বাসের ভেতরটা ভালো করে ঢেক করল, কিছু টুকিটাকি আবর্জনা পড়ে ছিল, সেগুলো কুড়িয়ে ট্রাস ব্যাগে ফেলে নিশ্চিত হয়ে তারপর আমাদের উঠতে বলল। মিনিট পল্লেরো লাগল ক্যাম্পাসে এসে পৌছাতে। কী সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছিমছাম পরিবেশ। চারদিক সবুজে ঢেকে আছে। ক্যাম্পাসে প্রবেশ মুখেই অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ, ডালপালা ছড়িয়ে পুরো জায়গা ছায়া দিয়ে রেখেছে। ঝিরবিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। কনকনে ঠাণ্ডা নয় তাই একটি চাদর জড়িয়ে নেয়াতেই কাজ হল। কোনো তাড়া নেই সেকারণে আজ্ঞে ধীরে পায়চারি করে দেখার আনন্দ উপভোগ করছিলাম। কত ছেলেমেয়ে, লোকজন

চারদিকে, কেউ একা একটি বেঞ্চে বসে পড়াশুনা করছে, আবার কোথাও দেখলাম কয়েকজন গোল হয়ে বসে গল্ল গুজব করছে। কোথাও ক্লাস চলছে আবার কোথাও ক্লাস শেষে সবাই দল বেঁধে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে আসছে। ক্লাস ডে তাই প্রচুর স্টুডেন্ট কিন্তু কোথাও কোনো হটগোল নেই। রাজনীতি নেই, ফলে কোথাও কোনো মিটিং মিছিলও দেখলাম না, সঙ্গী মারামারির প্রশ্ন উঠে না। ইউনিভার্সিটি আসার সময় কাস্টা বলেছিল এ ইউনিভার্সিটি এলাকা খুব বড়ে কিন্তু নয়। এখন পায়ে হেঁটে সব এলাকা ঘুরে দেখতে গিয়ে ভাবছি ছোটো ইউনিভার্সিটিরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বড়ো ইউনিভার্সিটিগুলো কেমন, হ্যত যানবাহনে করে ক্লাসে যেতে হয়। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের পৃথক পৃথক বিভিন্ন। ডিপার্টমেন্টগুলোর স্বতন্ত্র নামও আছে। বিভিন্নয়ের সামনে কাঠের প্ল্যাকার্ড নামগুলো লেখা আছে, পড়ে দেখার চেষ্টা করলাম। ক্যাম্পাসে চুকে বাম দিকের বিভিন্নগুলোর নাম সাক্ষামাটো হল, লাসেন হল, কাডেমা হল, মারিপোসা হল, ইউরেকা হল, লাইব্রেরী, তারপর ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন। ডান দিকের বিভিন্নগুলোর নাম লেখা আছে ইয়েসেমাইট বা জোসেমাইট হল, এর ইংরেজি বানান হল Yosemite, সোলানো হল, ক্যাপিট্রনো হল, আমাদের হল, তাহো হল ইত্যাদি। দুয়েকটি নাম আমার কাছে অন্তু লাগল, এবং সুন্দরও, কিন্তু অর্থ জানার চেষ্টা করলাম। বিশেষ করে মারিপোসা নামটির, মূলে এটা ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হল প্রজাপতি, বিভিন্নয়ের নাম বাংলায় প্রজাপতি, আমার বেশ মনোযোগ কেড়ে নিল। লাইব্রেরী বিভিন্নয়ের করিডোর দিয়ে যেতে একপাশে কম্পিউটার রুম। অনেক কম্পিউটার রাখা আছে এখানে, অনেকেই কম্পিউটারে কাজ করছে দেখলাম। আরেক পাশের রুমে পড়ার জন্য চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়াল ঘেষে শেলফগুলোতে থেরে থেরে বই সাজানো। লাইব্রেরী পার হয়ে একেবারে শেষ প্রাণে কাস্টাদের ডিপার্টমেন্ট। একটি আমেরিকান মেয়ে, এখানকার ছাত্রী, আমাদের বেশ কয়েকটি ছবি তুলে দিল। তাকে ধন্যবাদ জানালাম। এই ইউনিভার্সিটির ২০০২-০৩ বছরে স্টুডেন্ট সংখ্যা আঠাশ হাজার পাঁচশো আটান্ন জন। এগারো হাজার সাতশো সাইন্ট্রিশ জন ছাত্র এবং যোলো হাজার আটশো একশু জন ছাত্রী। এদের মধ্যে আভারজায়েট স্টুডেন্ট বাইশ হাজার পাঁচশো চৌষট্টি জন, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট পাঁচ হাজার নয়শো বিরানবাই জন। দেশ বিদেশের নানা জাতির স্টুডেন্ট আছে এখানে। অনুপ্রাপ্তিক হারে এশিয়ান স্টুডেন্টের পরিমাণ শতকরা ৭.৯% ভাগ। এখানে কয়েকটি একাডেমিক ডিডিশন আছে, কলেজ অফ আর্টস এন্ড লেটোরস, কলেজ অব বিজিনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলেজ অফ এডুকেশন, কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স, কলেজ অফ হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিস, কলেজ অফ ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড ম্যাথামেটিস, কলেজ অফ সোশাল সায়েন্স এন্ড ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজ ইত্যাদি। ২০০২-০৩ সালে স্টুডেন্টসের একটি আনুপ্রাপ্তিক হার এভাবে পেলাম। আফ্রিকান আমেরিকান ৫.৮% নেটিভ আমেরিকান ১.০%, এশিয়ান ৭.৯%, ফিলিপিনো ৮.০%, বিদেশী ২.৬%, হিস্পানিক ১২.৯%, অন্যান্য ১৪.৮%, প্যাসিফিক আইল্যান্ডার ০.৭%, সাউথ ইস্ট এশিয়া ৮.৫%, হোয়াইট ৪৬.১%, তথ্যগুলো আমি এভাবে পেয়েছি। কাস্টা পড়ছে কলেজ অব বিজিনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। ওদের ডিপার্টমেন্ট বিভিন্নয়ের সামনে কাঠের প্ল্যাকার্ড লেখা সাতশো স্বতর। ক্যাম্পাস হাউজিং হিসাবে পাঁচটি কো এডুকেশনাল রেসিডেন্সিয়াল হল

আছে। ইউনিভার্সিটির বার্ষিক বাজেটের তিনশো বাইশ মিলিয়ন ডলার আসে স্টেট জেনারেল ফাউন্ডেশন থেকে। প্রায় নয় মিলিয়ন ডলার আসে গিফট ও স্পেশাল রেভিনিউ থেকে, একান্তর মিলিয়ন ডলার আসে বিভিন্ন অনুদান থেকে। ম্যাসকট হচ্ছে হার্কি এন্ড হনেট, কালার হল গ্রীন ও গোল্ড। তিনশো একর জায়গা নিয়ে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ক্যাপিটল বিভিন্ন থেকে মাঝে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মেট্রোপলিটন এলাকায় জনবসতির সংখ্যা আয় দুই মিলিয়ন। এ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার জন্য এতগুলো কথা লিখলাম। কাস্টা আমাকে জানিয়েছিল আমেরিকার অপেক্ষাকৃত ছোটো ইউনিভার্সিটিগুলোর এটা অন্যতম। আমার মনে হল ছোটো ইউনিভার্সিটি যদি এত বড়ো হয় তাহলে বড়ো ইউনিভার্সিটি কত বড়ো না জানি হবে। মনে মনে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোর সঙ্গে এর একটি তুলনা করে নিলাম। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকে ছোটো করার জন্য নয় বরং দুয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক ধারণা এখানে পাওয়া যাবে। তবে এখানে বুয়েটের সুনাম আছে, স্বত্বত সেখানকার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যই। এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আরো বেশি জানতে যারা কৌতুহলী হবে তাদের জন্য তিনটি ওয়েব পেজের ঠিকানা দিলাম। এগুলোর একটি হল <http://www.csus.edu/pa/quickfacts/indexhtml> এর পরেরটি হল <http://www.csus.edu/utaps/map.pdf> এবং শেষেরটি হল <http://www.csus.edu/vtour>

কাস্টাদের ডিপার্টমেন্ট ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্পাসের আরেক প্রাণে চলে এলাম। এদিকে ক্যাম্পাসের সীমানা পার হলেই রিভার আমেরিকা। কাস্টার ইচ্ছা ছিল আমাকে রিভার আমেরিকা দেখাতে নিয়ে যাবে। আমার যাবার আগ্রহ করে গিয়েছিল কারণ যে পরিমাণ পথ হেঁটে এখানে এসেছি ঠিক সম্পরিমাণ পথ হেঁটে আবার বাস স্টপেজে যেতে হবে, এখন ফেরা দরকার। একটি সুন্দর জায়গা দেখে আমরা দূজনে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসলাম। সঙ্গে বিস্কুট আর পানি ছিল, এগুলো খেতে খেতে গল্ল করছি। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকেই একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, প্রথমে গুরুত্ব দেইনি, এখন দেখলাম এটা ঠিক দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত নয়। ক্যাম্পাসের ভেতরে অনেক গাছ, সবুজ পাতায় ডাল ডালাপালার মধ্যে আমেরিকান কাঠবেড়ালীগুলো মনের আনন্দে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। ক্যাম্পাসে যেখানে সেখানে আরো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কিন্তু মোরগ মুরগী, সাদা কালো ডোরাকাটা বিভিন্ন ধরনের। এক একটি সাইজ কী, কম করেও তিন কেজির ওপরে সব হবে। কাস্টা জানাল এগুলো নাকি মালিকবিহীন। কী নিশ্চিতে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনোটি আবার গাছের ডালের ওপর বসে আছে। এত লোকজন যাতায়াত করছে কেউ এনের দিকে খেয়াল করছে না, এরাও কাউকে দেখে ভয় পাচ্ছে না মোটেই। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছপালা সুতরাং কাঠবেড়ালী থাকা ঠিক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চারদিকে বড়ো বড়ো গাছপালা সুতরাং কাঠবেড়ালী থাকা ঠিক অস্বাভাবিক নয়। এরকম নির্ভর্য মোরগ মুরগী, এদের সংখ্যাও অনেক এবং তাও মালিকবিহীন, এরকম দৃশ্য করে কখনো কল্পনা করিন। হাসতে হাসতে কাস্টাকে জিজ্ঞাসা করলাম এরা সব কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট?

বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বাস আসতে মিনিট পরেরো বাকি আছে। আমাদের মত অনেকেই বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছে। একটি ছেলেকে দেখে অবাক

হলাম, পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্লাটার করা। তাচে ভর দিয়ে হাঁটো, সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। যে হাত দিয়ে ঢাচ্টা ধরে আছে, সে হাতেও ছোটোখাটো একটি ব্যান্ডেজ বাধা। অপর হাত দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা ধরে আছে। বোৰা যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে এসে থাকতে পারে। একদিন ক্লাস না করলে কি ক্ষতি তা ছেলেটিকে দেখে অনুমান করা যায়। ঠিক সময়ে বাস এসে থামল, একে একে সবাই বাসে উঠে বসলাম। এবার ড্রাইভার বাসটিকে রাস্তা বরাবর নীচু করে নামাল আর ছেলেটি তাচে ভর দিয়ে বাসে উঠে এল। বাস থেকে নামার সময়েও সে একইভাবে নেমে গেল, কারো সাহায্যের প্রয়োজন হল না। হইল চেয়ারের যাত্রাও বাসে এভাবে ওঠানামা করে।

বাসে করে এবার সোজা চলে এলাম কমিউনিটি কলেজে। এখানে বেশ কিছু এশিয়ান ছেলেমেয়ের দেখা পেলাম। শেলোয়ার কামিজ পরা দুজন মেয়েকেও দেখলাম। ওরা আমাদের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে চোখে চোখ পড়তেই তারা মিছি করে হেসে দিল। এখানে বেশিক্ষণ থাকলাম না, বাসায় ফেরার তাগিদ ছিল। আগের মতই বাসে আর লাইট রেলে করে বাসায় চলে এলাম।

নিজেই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, এখানে এত হাটাহাটি করি এত জায়গায় ঘুরে বেড়াই কিন্তু শরীরে কখনো সেভাবে ক্লান্তি মনে হয়নি। বরং হাটলে চললে শরীর আরো সচল ও ঘৰৱতৰে লাগে। নির্মল বাতাস, জনস্বাস্থ্রের ক্ষতিকর কিছু নেই। বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায়।

কান্তা আর আমি রোজ সকাল বিকাল ওদের হাউজিং কমপ্লেক্সটা হেঁটে হেঁটে চক্র দিতাম। এখানে বাসা থেকে কেউ খুব একটা বের হয় না। একদিন বিকালের দিকে হাঁটচিলাম, আশে পাশে কেউ নেই। চারদিকে চৃপচাপ, হঠাৎ শুনি বাচ্চা গলায় কে যেন ডাকছে। যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে ঘুরে দেখি একটি বাচ্চা ছেলে হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে। শেলোয়ার কামিজ পরা একজন মহিলা বাচ্চাটিকে সামলাতে ব্যস্ত। বুবতে পারলাম আমাদের পোশাক দেখে বাচ্চাটি পরিচিত মনে করে আমাদের ডাক দিয়েছে। আমরা হেসে তার দিকে হাত নাড়লাম।

জুয়েলের বক্স মুকুলের বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিল। মুকুল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ইনটেলে চাকুরি করে। মুকুলের বক্স তানিয়া CSUS-য়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রাঙ্গনেশন করছে। তানিয়ার বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস ছিল। ক্লাস থেকে বাসায় ফিরে তারপর আমাদের জন্য রান্নাবান্না করেছে। এখানেও দেখলাম রান্নার সেই একই অবস্থা। এ বাচ্চা মেয়েটি এত সুন্দর করে দেশীয় রান্না করেছে, অবাক হতে হয়। আমরা দেশে বসে সব বিদেশী রান্না শিখি আর এখানে এসে আমাদের দেশের মেয়েরা কি চমৎকারভাবে বিভিন্ন দেশীয় রান্নার চর্চা করছে। ওদের বাসায় দাওয়াতে আরো দুজন বাংলাদেশী ছেলে এসেছিল, তারা তানিয়ার একই ইউনিভার্সিটিতে অন্য সাবজেক্টে পড়ছে। এদের মধ্যে বাপী কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। যতক্ষণ ওরা ছিল বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গে বসে গল্প করল। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল দেশে বেড়াতে যাবার জন্য ওদের মন অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু দেশে ফিরে কোনো ভিসার সমস্যা হতে পারে সেকারণে ওরা এখন যেতে পারছে না। বাপীর গ্রাজুয়েশন হতে এখনো এক বছর বাকি। আমাকে পাঁচ বছরের মাল্টিপ্ল ভিসা দিয়েছে শুনে সে ক্ষেত্রের সঙ্গে বলল, আপনাদের তো পাঁচ বছরের

মাল্টিপ্ল ভিসা দেবেই। ওরা জানে এই বয়সে আপনারা এসে বেশি দিন থাকতে চাইবেন না, দেশে ফিরে যাবার জন্য কানাকাটি শুরু করে দেবেন। আমাদের মেখানে গ্রাজুয়েশন করতেই লাগে চার বছর সেখানে আমাদের মাত্র এক বা দুই বছরের ভিসা দেয়। ওর যুক্তিটা ফেলে দেবার মত নয়। তানিয়ার রান্না করা মজার মজার খাচ্ছিলাম এবং সবাই মিলে দেশের বাজারের অবস্থা নিয়ে গল্প করছিলাম। ইলিশ মাছের টুকরার সাইজ দেখেই বোৰা গেল মাছটা কত বড়ো ছিল। মাছ খেতে খেতে বাপী বলল, আন্তি জানেন, দেশে থাকতে কাটা বাহার ভয়ে মাছই খেতাম না। আমা কাটা বেছে দিত, তখন মাছ খেতাম। আর এখন আমি, ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, আর এখন কাটা বাহা তো কোন ছার। মাছ নিজে হাতে রান্না করে খেতে হয়, তাই নাঃ বাপী হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকাতে থাকল। খাবার এক পর্যায়ে তানিয়া আমের আচার নিয়ে এল। আম ছাড়াও বরই জলপাই আরো অনেক আচার এখানে পাওয়া যায়, প্রায় সবই। দেশীয় কোন জিনিসটি যে এখানে পাওয়া যায় না তা বলা কঠিন। কৌতুহল নিয়ে সকলেই দেশের কথা জিজ্ঞাসা করল। দেশে এখন বড়ো বড়ো ইলিশ মাছ কই মাছ পাওয়া যায় কিনা। আমি বললাম, কি করে পাওয়া যাবে বল, সবই তো তোমরা এখানে নিয়ে আসছ। এমন কি আমের আচারটিও বাদ দাওনি। সবাই হাসতে লাগল। বাপী যাবার সময় বলল, আন্তি আসি দোয়া করবেন আমাদের জন্য। অনেক দিন পর দেশের একজন মুরুবীর সঙ্গে গল্প করে খুব ভালো লাগল। আমি যত দিন আমেরিকায় আসিনি ততদিন দেশে বসে দূরে থেকে তাদের সমস্যাগুলো চোখে পড়েনি। এখানে এসে নিকটে থেকে ওদের দেখে ওদের সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জেনেছি। জীবনে উন্নতির আশায়, কেরিয়ার তৈরীর প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে, বিশ্বাজারের প্রতিযোগিতায় ঢিকে থাকারও প্রয়োজনে এরা সকলে আজ এত দূরদেশে এসেছে। মন পড়ে আছে দেশে মা বাবা আঁচ্ছীয় পরিজনের মধ্যে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে। আবার প্রবাসে কর্মরত ছেলেমেয়েরা তাদের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে, বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে চাপা করেও রেখেছে। এখন কোনো কারণে এদের যদি দেশে ফিরে যেতে হয় দেশ কি এদের শতকরা দশ ভাগকেও পুর্ণবাসন করতে পারবে? আমার সংশয় শেষ হয়নি।

কান্তা মুনিয়া ভাবীর বাসায় আরেক দিনের দাওয়াত। মুনিয়ার স্বামী জুয়েলের সহকর্মী। ওদের বাসা কান্তাদের বাসার কাছেই, আস্তে ধীরে হেঁটে গল্প করতে করতে চলে গেলাম। সেখানে আরো কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। মুনিয়ার হাতের টক আম দিয়ে রান্না কাচকী মাছ কালো জিরা দিয়ে লাউ রান্নার স্বাদ অনেকদিন মনে থাকবে। ওখানেও আলাপ হল অনেকের সঙ্গে, দেশের প্রসঙ্গ নিয়েই। একটি জিনিস সবখানেই পেলাম তা হল অক্সিম আন্তরিকতা, অনেকের সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয় কিন্তু কেউ আমাকে দূরের বলে মনে করেনি। বিদেশ বিড়ুই আসলে সব পার্থক্যকে মুছে দেয়। একটি জিনিসই বড়ো হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হল সকলেই আপনজন। কলক কান্তা যখন প্রথম আমেরিকায় আসে তখন আমার টেনশন ছিল যে তারা একা, নিঃসঙ্গ থাকবে। এখনে এসে দেখলাম তারা পরিজন সৃষ্টি করে নিয়েছে, সকলেরই এভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়, এটাই সত্য।

মার্চ মাসের চোল্দ তারিখে রাত বারেটার ফ্লাইটে আবার অস্টিনে ফিরে যাব। পেছনে রেখে যাব কান্তা আর জুয়েলকে, তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও। মনটা কেমন ব্যাথায় টন্টন করছিল।

এখন এই মুহূর্তে দেশের জন্য মন কাঁদছে না, মন ভারি হয়ে আছে যাদের এখানে রেখে যাচ্ছি তাদের জন্য। আবার কবে কখন কোথায় তাদের সঙ্গে দেখা হবে, কে জানে? অস্টিনে ফিরে যাবার আগের দুই দিন দূরে আর কোথাও বেড়াতে গেলাম না। কাত্তা আর আমি দুজন পায়ে হেঁটেই আশে পাশে ঘুরে বেড়ালাম আর কখনো ঘরে বসে গল্ল করলাম।

আট.

চৌদ্দ মার্চ বিকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, সন্ধ্যায় বৃষ্টি ও শুরু হল। রাত বাড়ার সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা আর বৃষ্টি বাড়তে থাকল। আমি আজ অস্টিনে ফিরে যাব সেজন্য জুয়েল অফিস থেকে বিকেল চারটের সময় বাসায় চলে এসেছে। এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে আমি একটু ভয় পেলাম। জুয়েল আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, এটা কোনো ব্যাপারই নয়। প্লেন ঠিকমতই ছাড়বে, কোনো অসুবিধা হবে না। আমি খাওয়া দাওয়া সেরে ওদের সঙ্গে গল্ল করছি, জুয়েলের একজন বন্ধু এল, সে তার মার জন্য কিছু শুধু আমার কাছে দিয়ে গেল। রাত দশটায় বাসা থেকে সাক্ষামাটো বিমানবন্দরের দিকে রওয়ানা দিলাম। ততক্ষণে বৃষ্টি আরো কমে এসেছে। বিমানবন্দরের সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে তেতরে চুকে গেলাম। আকাশের অবস্থা বেশি ভালো নয়, ওদের আটকে রাখলাম না। ওরা বাসায় ফিরে যাবে, এবারকার মত ওদের সঙ্গে এই আমার বিদায় মুহূর্ত। কাত্তা আমাদের বেড়া আমা সেভাবেই তাকে ডাকি। কাত্তার চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল, জুয়েল বেটাছে লেবিশগুলাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ওদের একটু আড়াল করে চোখ মুছলাম। মনে মনে সাজ্জনা পেলাম ওরা ভালো আছে। জীবনে পরাজিত হবার সুযোগ নেই, ওরা দুজনেই অত্যন্ত ভালো, সৎ ও কর্মনির্ণ। আলাই ওদের সকলেরই অশেষ মঙ্গল করুন।

যথাসময়ে প্লেনে এসে উঠলাম। সাক্ষামাটো যখন আসি তখন অস্টিন এবং ডালাস থেকে আমার যাত্রাগুরু ছিল দিনে, পৌছেছিলাম দিন শেষে, রাতে। এখন ডালাস ও অস্টিনে ফেরার যাত্রা শুরু হল রাতে হ্যাত পৌছাব রাত শেষে, দিনের শুরুতে। প্লেন ছাড়ল, তখনে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার পাশেই একজন চাইনিজ ছেলে ছিল আমার অন্যতম সহযাত্রী। বাকি আমেরিকান, পুরুষ মহিলা সবই। গভীর রাত, মেষ বৃষ্টির মধ্যে বাইরে কিছুই আর দেখা যায় না। ক্লান্ত ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ডালাস বিমানবন্দরে প্লেন নামার অল্প কিছুক্ষণ আগে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাইলটের ঘোষণা শুনলাম, আমরা এখন এ ফোর্টিন গেইটে ল্যান্ড করব। আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, আমার অস্টিনগামী পরের ফ্লাইটের গেইট নম্বর সি-থার্টি। তার মানে আমাকে টার্মিনাল চেঞ্জ করতে হতে পারে। আগেই শুনেছিলাম, ডালাস বিমানবন্দরে টার্মিনাল চেঞ্জ করতে হলে নাকি অনেক সময় মনোরোপে যেতে হয়। তার মানে এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনালের দূরত্ব অনেক। কি করব ভাবতে ভাবতে গেইট দিয়ে বের হয়ে দেখি একজন কালো ড্রাইভার টার্মিনালের ভেতরেই চলাচল করা ছাটো খোলা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ

গাড়িগুলো সাধারণত বয়স্ক বা অসুস্থ যাত্রী যাবা বেশি দূর হাঁটতে পারবে না তাদের জন্য। তখন ভোর পাঁচটা, অন্ধকার ঠিকমত কাটেনি। আমি সোজা ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললাম, দেখো আমার নেক্সট ফ্লাইটের গেইট নম্বর সি-থার্টি তুমি কি আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে? সে আমার টিকেটটা নিয়ে সামনের কাউন্টারে কম্পিউটারে একটু খুটখুট করে নিশ্চিত হয়ে তারপর আমাকে বলল, চলো। এসকল গাড়ি টার্মিনালের ভেতরেই চলাচল করে সেকারণে খুব আস্তে চলে। আমি একাই বসে আছি গাড়িতে। সাধারণত সিনিয়র সিটিজেনেরা এ গাড়িতে চড়ে, যাদের বয়স ষাট বছরের বেশি তারা সিনিয়র সিটিজেন। বয়স যাদের কম তারা সবাই হেঁটে যাচ্ছে, এ গাড়িতে ঘোঁটার কথা ভাবছে না। ভোর প্রায় পাঁচটা বাজে, এমনিতেই সোকজন কম। একটি দরজার সামনে দুজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার তাদের গাড়িতে ঘোঁটার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ওরা মনোরোপে যাবে বলল। আরো কিছুদূর এগোনোর পর আমার চেয়ে কম বয়সী একজন মহিলার দেখা পেলাম। সে মহিলা আস্তে ধীরে টার্মিনাল সি-এর দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভার তাকে বলল, তুমি আমার গাড়িতে আসতে পারো। মহিলাটি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। গাড়ি আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছে। এ গাড়ির গতি এবং মানুষের দ্রুত হেঁটে যাবার গতি প্রায় সমান। হঠাৎ শুনলাম পেছন দিকে কে যেন দৌড়ে আসছে। একটি অল্পবয়সী কালো মেয়ে হাফাতে হাফাতে এনে ড্রাইভারকে বলল, আমার প্লেন লেট ছিল এবং নেক্সট ফ্লাইট ছাড়তে মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। তুমি কি আমাকে সি-চুয়েনটি নাইন গেইটে নামিয়ে দিতে পারবে? ইয়েস, বলে ড্রাইভার মেয়েটিকে উঠিয়ে নিল। নির্দিষ্ট গেইটে পৌছাতে আরো দশ মিনিট লেগে গেল ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গাড়ি থেকে মেঝে পড়লাম। কাত্তা আমার সঙ্গে যাবার প্যাক করে দিয়েছিল তাই দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম। ঘন্টাদুয়েক পরে যখন ডালাস থেকে প্লেন ছাড়ল তখন চারদিকে রোদ ঝালমল করছে। এর আগে কনকদের সঙ্গে ডালাসে দুইবার বেড়াতে এসেছি, গাড়িতে আসা যাওয়া করেছি। এবারকার যাওয়া আসা এক এবং অনেকটা আত্মবিশ্বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে। প্লেন যখন চলতে শুরু করল তখন যাকমকে দিনের শুরু, জানালা দিয়ে এখনকার চারপাশের পৃথিবী দেখা যায়। রাতে ঘুমিয়েছিলাম, এখন তেমন ঝুঁতি নেই সুরাং সব কিছু দুচোখ ভরে দেখার সুযোগ হল। শুরু হয়েছিল বালমলে দিন দিয়ে, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে অস্টিনে এসে পৌছালাম। প্লেনের মধ্যে বসেই দেখছিলাম রোদ ক্রমেই দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, অস্টিনে যখন নামলাম সব কিছু ঘন কুয়াশায় ঢাকা। প্লেনের চাকা যখন বিমানবন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করল তখনই মাত্র মাটি চোখে পড়ল। তার আগে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। একটু দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল, এরপ ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাসা থেকে এতদূর গাড়ি চালিয়ে আসতে কনকের অসুবিধা হবে। মনে মনে চাঞ্চিলাম কনকরা যেন বাসা থেকে একটু দেরি করে বের হয়। আমার লাগেজ আসতেও একটু সময় লাগল। তারপরেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি নিজেই স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে বাইরে এলাম। বাইরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কনকের লাল গাড়িটা এসে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে, একটু রোদ উঠি দিচ্ছে। আমাকে নিতে কনক থামল। কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, একটু রোদ উঠি দিচ্ছে। আমাকে পারিসা এবং নাহিদ তিনজনেই এসেছিল। পেছনে হেঁটে এসেছিলাম কাত্তা আর জুয়েলকে, পারিসা এবং নাহিদ তিনজনেই এসেছিল। কনকের মন্টা ভার হয়ে ছিল, তার ওপর রাতভর বৃষ্টি আর কালো মেঝের আনাগোনা। কনকদের মন্টা ভার হয়ে ছিল, তার ওপর রাতভর বৃষ্টি আর কালো মেঝে নিয়ে অপেক্ষা করছে। এদের সকলকেই পেছনে দেখে আমার মনের ভার একটু কাটল তবে এটাও সাময়িক।

ছেড়ে রেখে দেশে ফিরতে হবে। প্রায় ফেরার সময় হল। মনের মধ্যে খালি ভোসে থাকবে পারিসার মুখ, বাকি সকলেরই। কখনো অশ্রুসিক্ত, আবার কখনো উজ্জ্বল হাসি নিয়েই। কানের মধ্যে বাজতে থাকবে যেন কনক বলছে, আম্মা তোমাকে কালোরাডো নদী দেখিয়ে নিয়ে আসি চল, যেন কাঞ্চ বলছে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে আমি এই টেবিলে বসে পড়াশুনা করি, কম্পিউটার ল্যাবে এখানে এই কম্পিউটার নিয়ে কাজ করি।

কনক সূচকেস্টা গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। পারিসা আমার পাশে বসে। পারিসা আমার খেলার সাথী, বেশ কয়েক দিন পরে আবার তার কাছে ফিরে এলাম। কাঞ্চার বাসা থেকে পারিসার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে, আমার দেখার সুযোগ ছিল না। আমিও সব সময় পারিসাকে অনুভব করতাম। এখন অন্ত সময়ের জন্য হলেও আবার আমরা দুজন একত্রে গাড়িতে পাশাপাশি বসে, অস্টিনে বাসায় ফেরার পথে। যে পথ দিয়ে কনক আমাকে পৌছে দিয়ে গিয়েছিল এখন ফিরছি সে পথে। তখন পারিসা পাশে ছিল এখনো পারিসা আমার পাশেই বসে। রাস্তার দুপাশে ঘাসের ভেতর দিয়ে নানা রঙের বুনো ফুল ফুটতে শুরু করেছে, যাবার সময় এভাবে দেখিনি।

সাবাদিন বিশ্বাম নিয়ে বিকালে আমরা একটু বেড়াতে বের হলাম। রাতে নাহিদের সহপাঠী বন্ধু ইকোর বাসায় দাওয়াত। তখন ইরাক আক্রমণের পাঁয়তারা চলছে, সকলের মনে একই প্রশংসন বৃশ কবে ইরাক আক্রমণ করতে পারে। সতেরো মার্চ প্রেসিডেন্ট বৃশ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে, এ ভাষণেই বোঝা যাবে আসলে কি হতে যাচ্ছে। টিভির সকল নিউজ চ্যানেলে এই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে খবর প্রচারিত হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার বড়ো বড়ো শহরগুলোতে যুদ্ধবিরোধী র্যালী হচ্ছে। ইউটি অস্টিনের স্টুডেটেরা ঘোষণা করেছে যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে ওরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল বের করবে।

যোলো তারিখ রবিবার আমরা সবাই গেলাম সালিমার নামে একটি পাকিস্তানী রেস্টুরেন্টে। জন প্রতি লাখ পাঁচ ডলার করে। ভাত পোলাও মাছ মাংস সবজী ডাল সব কিছুই আছে। যার যেটা খুশি এবং যত খুশি খেতে পারে। আমরা দুপুরের খাবার এখানেই সেরে নিলাম। এখানকার ক্রেতা বেশির ভাগই এশিয়ান, এদের রান্নাটাও বেশ ভালো। এবারের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ডকাপের সব কয়টি খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই রেস্টুরেন্টে। ডিনারসহ প্রতিটি খেলার টিকিটের হার ছিল আট ডলার। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের সমর্থকরা এখানে খেলা দেখতে এসেছিল। আর ইতিয়ান সমর্থকরা খেলা দেখেছে অন্য একটি রেস্টুরেন্টে। অনেকে আবার নিজেদের বাসায় চাঁদা তুলে খেলা দেখার ব্যবস্থা করেছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর মিষ্টি পান কিনে খেতে খেতে বের হয়ে এলাম। এখানে একটু দেশীয় পরিবেশ চোখে পড়ল। রেস্টুরেন্টের বারান্দায় কয়েক জ্যায়গায় পানের পিক পড়ে আছে, দেখে বেশ খারাপই লাগল।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি তাই একটু একটু গরম পড়তে শুরু করেছে। কনক গাড়ির এসি বন্ধ করে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল। নির্মল বাতাসে চোখে প্রায় ঘূম এসে গেল। ডাউনটাউনের পাশ কাটিয়ে আরো সাউথের দিকে চললাম লেডি বার্ড ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার সেন্টার দেখার জন্য। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিস্টন বি জনসনের স্তৰী লেডি বার্ড

জনসনের উদ্যোগে এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়, এর নামকরণ সেভাবে হয়েছে। পৃথিবীতে যত রকমের বুনো ফুল আছে তার প্রায় সবই সংগ্রহ করে এখানে লাগানো হয়েছে। যথারীতি টিকেট কেটে তেতরে চুকলাম। প্রথমেই হাতের বাম দিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটি হলুক্ষম সেখানে বিক্রির জন্য নানা রকমের জিনিস সাজানো। ভারতীয় নকশী কাঁথা দেখলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সবই কিছু কেনার মত কিছুই পছন্দ হল না। পুরো এলাকাটাই দেখলাম। ক্ষেত্রে যেমন ধান পাট লাগানো হয় এখানেও প্রায় সেভাবে ছোটো ছোটো ব্লক তৈরী করা হয়েছে। একেকটি ব্লকে একেক রকমের বুনো ফুলের চারা লাগানো হয়েছে। এখন কেবল মার্চ মাস, তাই দুই তিনি রকমের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। মে মাসের দিকে সব রকমের কিংবা অধিকাংশ ফুল যখন ফোটে তখন নাকি যতদূর দেখা যায় সবখানেই লাল নীল কমলা বেগুনী হলুদ ইত্যাদি নানান রঙের মেলা বসে যায়। পুরো এলাকা ভালো করে দেখার জন্য একটি উঁচু টাওয়ার আছে। পাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে টাওয়ারের একেবারে ওপরে উঠে গেলাম। আসলেই এখন থেকে চারদিক খুবই সুন্দর বলে মনে হয়। অনেক বুড়ো বুড়ীকে দেখলাম অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখছে সব কিছু। দুয়েকজন হ্যাঙ্কিয়াম দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি গাছ দেখছে। একজন প্রকৃতি প্রেমিককে দেখলাম ম্যাগনিফিইং প্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি গাছ দেখছে। একজন বুড়ী আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে সব দেখছে। মুখের ভাজপড়া কোচকানো চামড়া দেখেই অনুমান করা যায় তার বয়স আশির ওপরেই হ্যাত হবে। তোবড়োনা পাতলা ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক লাগানো। কানে গলায় দামী পাথরের দুল ও মালা। হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি দামী পাথর বসানো আংটি। গায়ে খুব সুন্দর সুগন্ধি মাখা। আমার দিকে তাকিয়ে শিত হেসে বলল, কী সুন্দর জায়গা তাই না! আমি হেসে বললাম, ইয়েস। মনে মনে বললাম তুমি তার চেয়েও সুন্দর। এরকম বুড়ো বুড়ীকে আরো অনেকবার দেখেছি, হয় একা না হয় জোড়ায় ঘুরে বেড়াতে। সাউথ ফর্ক র্যাঙ্কে এমন একজন বুড়োকে দেখেছি যে বয়সের ভারে কাঁপছিল। একজন গাইড ধরে ধরে তাকে সব কিছু দেখাচ্ছিল। একতলা থেকে দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তার সময় লেগেছে দশ মিনিট, সেই সময়টুকু আমরা নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। সাক্রামান্টো ডাউনটাউন মলে এরকম একজন বুড়ীকে দেখিয়ে কাঞ্চা বলছিল, আমা দেখ এই বয়সে কী সুন্দর একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দেখে তোমরাও একটু শেখ। আমি কিছু এটা দেখে একটু শেখার আগ্রহ বোধ করিনি। কাঞ্চাকেও বললাম সে কথা। বরং আমা দুঃখ লেগেছে। মনে হয় ওদের ঘরে কেউ নেই এবং ঘরে কোনো আকর্ষণও নেই। তাই এই বয়সে একা একা ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে। সকলের চেহারার মধ্যে যে বেড়ানোর আনন্দ লক্ষ্য করলাম তাও নয়। লেডি বার্ড ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার সেন্টার দেখা শেষ করে রওয়ানা হলাম ডাউনটাউনের দিকে। প্রথম যেদিন অস্টিনে আসি সেদিন রাতের বেলায় আলোকসজ্জা দেখার জন্য ডাউনটাউনে এসেছিলাম। এরপর দিনের বেলায় এর পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি, ভেতরে ঘুরে দেখা হয়নি। ভালোভাবে দেখার জন্য আজ দিনের বেলায় এলাম। ডালাস আর সাক্রামান্টো ডাউনটাউন আগেই দেখেছি, অস্টিনে ডাউনটাউন আমার কাছে বেশি সুন্দর, পরিষ্কার ও খোলামেলা মনে হল। আজ রবিবার ছুটির দিন, তাই গাড়ি পার্ক করতে ডলার লাগবে না। অস্টিন মিউজিয়ামের উল্টো পাশে গাড়ি পার্ক করে আমরা হেঁটে হেঁটে চারদিক ঘুরে দেখলাম। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য পাশে গাড়ি পার্ক করে আমরা হেঁটে হেঁটে চারদিক ঘুরে দেখলাম।

দেখলাম। যে কেউ ইচ্ছা করলে কয়েক ডলারের বিনিময়ে এই ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে পারবে। টেক্সাসের প্রতীক হচ্ছে একটি তারা। মিউজিয়াম বিভিন্নয়ের সামনে প্রায় দশ বারো ফুট উচু একটি তারা বাসিয়ে স্থাপন করা আছে। মেরিকানদের সঙ্গে বড়ো রকমের শুল্ক করে আমেরিকানরা এই টেক্সাস দখল করে। মিউজিয়ামটি অত্যন্ত বড়ো, একে বিশাল বলা যায়। এখনে একটি অডিটোরিয়াম আছে, টেক্সাসের ওপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারী এ অডিটোরিয়ামে দেখানো হয়। দিনের মধ্যে কয়েকবার এটা দেখা যায়। ডকুমেন্টারী ছবির টিকেট কেটে নাহিন আর আমি মিউজিয়ামের ভেতরে চুকলাম। ফিল্ম শুরু হতে এখনো পয়তালিশ মিনিট বাকি আছে। পুরো মিউজিয়ামটি ভালোমত ঘুরে দেখলাম। এর একটি অংশ আছে যেখানে ফটো তোলা নিষেধ। একটি বড়ো হলুকমে টেক্সাসের লোকদের ব্যবহৃত পোশাক রাখা আছে। এগুলো সেই পুরাণে আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ব্যবহৃত সব ধরনের পোশাকের নমুনা। টেক্সাসের বেশ কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত একটু রশ্মি অঞ্চল বলে মনে হয় সে কারণেই হয়ত এখনকার পোশাকে জরি চুমকির কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। দোতলায় একটি খোলামেলা প্রশস্ত জ্যাগায় এসে দেখলাম বেশ কয়েকটি মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। এর ঠিক মাঝখানে একটি পুরাণে দেয়ালের অংশ। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে গর্ত হয়ে পলেন্টারা খসে পড়েছে। মাটিতে আশে পাশে পড়ে আছে কয়েকটি পুরাণে আমলের ভাঙা বন্দুক। জ্যাগায় জ্যাগায় কালচে রঙের দাগ। এ দেয়ালটিকে কেন্দ্র করে পুরো পরিবেশটিই যেন একটি কাহিনী বলছে। পরে ডকুমেন্টারী ছবিটি দেখে জেনেছি এখনেই মেরিকানদের সঙ্গে শুল্ক হয়েছিল আমেরিকানদের আর একে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হয়েছে মিউজিয়াম বিভিন্নটি। যথাসময়ে অডিটোরিয়ামে এসে বসলাম। বেশী দর্শক নেই। আমাদের পেছনের সারিতে চার পাঁচ জন বসেছে একেবারে সামনের সারিতে চৌল পনেরো জন মেরিকান দর্শক বসেছে। কিভাবে আমেরিকানরা এখনে এসে বসতি স্থাপন করল, চাষাবাস শুরু করল তারপর একসময় এখনকার প্রকৃত অধিবাসী মেরিকানদের সঙ্গে শুল্ক করে টেক্সাস দখল করল। সেসবেরই বীরতৃগাঁথা পনেরো মিনিট ধরে দেখানো হল। দেখানো হল আমেরিকানদের সংগ্রাম আর সাফল্যের কথা। আমি মনে মনে সামনের সারিতে বসা মেরিকান দর্শকদের কথা ভাবছি, তাদের কেমন লাগছে? এই অডিটোরিয়ামটি একটি অত্যাধুনিক থিয়েটার। এ ধরনের হলে বসে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। পর্দায় যখন দেখানো হচ্ছিল প্রচও বৃষ্টি পড়ছে তখন ন্যাচারাল ইফেক্ট দেয়ার জন্য ওপর থেকে দর্শকদের গায়েও ছিটকেটা পানি এসে পড়ছিল। যখন প্রচও বৃষ্টি বইছিল তখন দর্শকদের চেয়ারের পাশ থেকে বাতাস ছাঢ়া হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরাও বড়ের মধ্যে আছি। আবার যখন র্যাটল মেক কুঁঠলি পাকিয়ে ফেঁস ফেঁস করছিল তখন সীটের দুপাশ চেপে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন সাপগুলো আমাদেরই পেঁচিয়ে ধরেছে। পেছনের সারিতে বসে থাকা বাচ্চাগুলো মজা পেয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল।

মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এলাম টেক্সাস গভর্নরের সরকারি ভবন ক্যাপিটল বিভিন্নয়ে। কনক গাড়ি নিয়ে যথারীতি ক্যাপিটল বিভিন্নয়ের মেইন গেইট দিয়ে সোজা চুক্তে গেল কিন্তু বাধা সাধল একজন পুলিশ অফিসার। গাড়ি গেইটের বাইরে পার্ক করতে বলল। কনকের প্রশ্নের জবাবে পুলিশ অফিসার বলল আগে চুক্তে দেয়া হলেও

এগারো সেপ্টেম্বরের পর থেকে ভিজিটরদের গাড়ি ভেতরে নিতে দেয় না। গাড়ি আবার ঘুরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পার্ক করা হল। ভালোই হল, পায়ে হেঁটে বেড়াতেই ভালো লাগছিল। সুন্দর পরিবেশ, নির্মল বাতাস, সতীষ বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায়। পারিসার আর আমার বয়স এক হয়ে গেছে, কনকের কাছেও আমরা তার দুই মেয়ে, আমি বড়ো পারিসা ছেটো। পারিসা আর আমি দূজনে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কনক আমাদের ছবি তুলে বেড়াচ্ছে আর নাহিন আস্তে দীরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ক্যাপিটল বিভিন্নয়ের বিশাল চতুর পরিকল্পনা পরিচ্ছন্ন, মসৃণ ঘাসে ঢাকা। ঘাসে কেবল সবুজ রঙ ধরতে শুরু করেছে। বড়ো বড়ো গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। হাঁচৎ খেয়াল করলাম খুব বড়ো একটি গাছের ডাল মাটি থেকে মাত্র এক হাত উঁচুতে ঝুলে আছে। ডালটি এমনভাবে ঝুলে যে তার ওপর বসে সহজে দেল খাওয়া যায়। মনে মনে সেরকম আঁচাহের সৃষ্টি হল। কনককে বললাম, পারিসা আর আমি ঐ ডালের ওপর বসে দেল খাই আর ভূমি আমাদের ছবি ওঠাও। কথাটা বলেই পারিসার হাত ধরে জোরে হাঁচিলাম। কনক তাড়াতাড়ি আমাদের ডাক দিয়ে নিষেধ করল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। নিকটে গিয়ে দেখি গাছের ডালে একটি নোটিশ ঝোলানো আছে। এতে লেখা, গাছের ডালটি কেউ স্পর্শ করবে না। বুলালাম, পারিসা আর আমার মত অতি উৎসাহী লোকজনের জন্য এই সতর্কতা। ক্যাপিটল বিভিন্নয়ের ভেতরে চুক্তেই দেখি সামনে উচু একটি টেবিল, তার ওপাশে বিশালদেহী কালো গার্ড দাঁড়িয়ে ভিজিটরদের ব্যাগ পরিকল্পনা করে তারপর চুক্তে দিচ্ছে। এরকম ব্যবস্থাও এগারো সেপ্টেম্বরের পরেকার। আগে এমনিতেই সবাই চুক্তে পড়তে পারত। আমার কাছে কোনো ব্যাগ ছিল না। কনকের হাতের ক্যামেরা আর নাহিদের ব্যাগ পরিকল্পনা করে ফেরত দিল। পারিসা ওর পুতুলটা গার্ডের হাতে তুল দিল। এক গাল হেসে পুতুলটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে পুতুলটা আবার পারিসার হাতে ফেরত দিল। সকল স্টেটের রাজধানীতে গভর্নরের সরকারি ভবন অর্থাৎ ক্যাপিটল বিভিন্ন আছে। সব কয়টি ক্যাপিটল বিভিন্নয়ে একটি মিউজিয়াম আছে, স্টেটের সকল ইতিহাস সম্পর্কযুক্ত দলিলপত্র এ মিউজিয়ামে রাখা আছে। মিউজিয়াম দেখা শেষ করে যখন বের হয়ে আসি তখন ঐ গার্ড পারিসাকে আবার আদর করে ধন্যবাদ জানাল।

সর্বাই একটি ব্যাপার দেখছি ওরা বাচ্চাদের খুব শুরুত দেয়। বাচ্চাদের জন্য বা অপরাধের জন্য মা বাবাকেই সতর্ক করে দেয়। কনকের বাসায় দাওয়াতে ওর বন্ধুরা বউ বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিল। ঘর ভর্তি সব লোকজন সবাই গঁগুজুর করছে। ওদিকে বাচ্চারা মহান্দে হৈ তৈ লাফালাফি করছে। কয়েকজন বিছানার ওপর, কয়েকজন মেঝেতে লাফাছে। খেলাখুলার পরিস্থিতি প্রথমে হাসাহাসি লাফালাফি, তারপর হৈ তৈ এরপর মারামারি এবং চিৎকার কানাকাটি। একজন তো আবার বাথরুমের মধ্যে আটকা পড়ে চিৎকার। বাচ্চাদের মায়েদের হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা আয়তে এল এবং কিছুটা শান্ত হল। খেয়াল করলাম সকল মা নিজ নিজ বাচ্চাকে বকা দিল, অন্য বাচ্চার ওপর দোষারোপ করল না। একজন মাকে বলতে শুলালাম, ইস, ছেলেটা খুব দুঁষ্ট হয়েছে, আমাকে একেবারে পাগল করে ছাড়ে। একেক সময় মনে হয় চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু ভয়ও লাগে কখন পুলিশের কামে যায় তখন আবার কি করবে কে জানে। শুলালাম, এ দেশে নাকি কোনো বাচ্চা মায়ের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনায় পড়লে সেই মাকেই একবার দুইবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তৃতীয়বার একই ঘটনা ঘটলে বাচ্চাকে মায়ের নিকট থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

দেখলাম। যে কেউ ইচ্ছা করলে কয়েক ডলারের বিনিময়ে এই ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে পারবে। টেক্সাসের প্রতীক হচ্ছে একটি তারা। মিউজিয়াম বিল্ডিংয়ের সামনে প্রায় দশ বারো ফুট উচু একটি তারা বানিয়ে স্থাপন করা আছে। মেরিকানদের সঙ্গে বড়ো রকমের যুদ্ধ করে আমেরিকানরা এই টেক্সাস দখল করে। মিউজিয়ামটি অত্যন্ত বড়ো, একে বিশাল বলা যায়। এখানে একটি অডিটোরিয়াম আছে, টেক্সাসের ওপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারী এ অডিটোরিয়ামে দেখানো হয়। দিনের মধ্যে কয়েকবার এটা দেখা যায়। ডকুমেন্টারী ছবির টিকেট কেটে নাহিন আর আমি মিউজিয়ামের ভেতরে চুকলাম। ফিল্ম শুরু হতে এখনো পয়তাঙ্গিশ মিনিট বাকি আছে। পুরো মিউজিয়ামটি ভালোমত ঘুরে দেখলাম। এর একটি অংশ আছে যেখানে ফটো তোলা নিষেধ। একটি বড়ো হলরুমে টেক্সাসের লোকদের ব্যবহৃত পোশাক রাখা আছে। এগুলো সেই পুরাণো আমল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ব্যবহৃত সব ধরনের পোশাকের নমুনা। টেক্সাসের বেশ কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত একটু রক্ষণ্য অধিক বলে মনে হয় সে কারণেই হয়ত এখনকার পোশাকে জরি চূমকির কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। দেওতলায় একটি খোলামেলা প্রশস্ত জায়গায় এসে দেখলাম বেশ কয়েকটি মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। এর ঠিক মাঝখানে একটি পুরাণো দেয়ালের অংশ। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে গর্ত হয়ে পলেন্টারা খসে পড়েছে। মাটিতে আশে পাশে পড়ে আছে কয়েকটি পুরাণো আমলের ভাঙা বন্দুক। জায়গায় জায়গায় কালচে রাস্তের দাগ। এ দেয়ালটিকে কেন্দ্র করে পুরো পরিবেশটিই যেন একটি কাহিনী বলছে। পরে ডকুমেন্টারী ছবিটি দেখে জেনেছি এখানেই মেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল আমেরিকানদের আর একে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হয়েছে মিউজিয়াম বিল্ডিংটি। যথাসময়ে অডিটোরিয়ামে এসে বসলাম। বেশী দর্শক নেই। আমাদের পেছনের সারিতে চার পাঁচ জন বসেছে একেবারে সামনের সারিতে চৌদ পনেরো জন মেরিকান দর্শক বসেছে। কিভাবে আমেরিকানরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করল, চাষাবাস শুরু করল তারপর একসময় এখনকার প্রকৃত অধিবাসী মেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে টেক্সাস দখল করল। সেসবেরই বীরত্বগাথা পনেরো মিনিট ধরে দেখানো হল। দেখানো হল আমেরিকানদের সংগ্রাম আর সাফল্যের কথা। আমি মনে মনে সামনের সারিতে বসা মেরিকান দর্শকদের কথা ভাবছি, তাদের কেমন লাগছে? এই অডিটোরিয়ামটি একটি অত্যাধুনিক থিয়েটার। এ ধরনের হলে বসে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। পর্দায় যখন দেখানো হচ্ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে তখন ন্যাচারাল ইফেক্ট দেয়ার জন্য ওপর থেকে দর্শকদের গায়েও ছিটেফোটা পানি এসে পড়ছিল। যখন প্রচণ্ড বৃষ্টি বইছিল তখন দর্শকদের চেয়ারের পাশ থেকে বাতাস ছাড়া হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরাও ঝড়ের মধ্যে আছি। আবার যখন র্যাটল মেক কুঙলি পাকিয়ে ফেঁস ফেঁস করছিল তখন সীটের দুপাশ চেপে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন সাপগুলো আমাদেরই পেঁচিয়ে ধরেছে। পেছনের সারিতে বসে থাকা বাচ্চাগুলো মজা পেয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল।

মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এলাম টেক্সাস গৱর্নরের সরকারি ভবন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে। কনক গাড়ি নিয়ে যথারীতি ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের মেইন গেইট দিয়ে সোজা চুক্তে গেল কিন্তু বাধা সাধল একজন পুলিশ অফিসার। গাড়ি গেইটের বাইরে পার্ক করতে বলল। কনকের প্রশ্নের জবাবে পুলিশ অফিসার বলল আগে চুক্তে দেয়া হলেও

এগারো সেপ্টেম্বরের পর থেকে ভিজিটরদের গাড়ি ভেতরে নিতে দেয় না। গাড়ি আবার ঘুরিয়ে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পার্ক করা হল। ভালোই হল, পায়ে হেঁটে বেড়াতেই ভালো লাগছিল। সুন্দর পরিবেশ, নির্মল বাতাস, সত্যিই বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায়। পারিসার আর আমার বয়স এক হয়ে গেছে, কনকের কাছেও আমরা তার দুই মেয়ে, আমি বড়ো পারিসা ছোটো। পারিসা আর আমি দুজনে মিলে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কনক আমাদের ছবি তুলে বেড়াচ্ছে আর নাহিন আস্তে ধীরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের বিশাল চতুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মসৃণ ঘাসে ঢাকা। ঘাসে কেবল সবুজ রঙ ধরতে শুরু করেছে। বড়ো বড়ো গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম খুব বড়ো একটি গাছের ডাল মাটি থেকে মাত্র এক হাত উঁচুতে ঝুলে আছে। ডালটি এমনভাবে ঝুলছে যে তার ওপর বসে সহজে দোল খাওয়া যায়। মনে মনে সেরেকম আগ্রহের সৃষ্টি হল। কনককে বললাম, পারিসা আর আমি এই ডালের ওপর বসে দোল খাই আর তার খুমি আমাদের ছবি ওঠাও। কথাটা বলেই পারিসার হাত ধরে জোরে হাটছিলাম। কনক তাড়াতাড়ি আমাদের ডাক দিয়ে নিষেধ করল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। নিকটে গিয়ে দেখি গাছের ডালে একটি নোটিশ ঝোলানো আছে। এতে লেখা, গাছের ডালটি কেউ স্পর্শ করবে না। বুবলাম, পারিসা আর আমার মত অতি উৎসাহী লোকজনের জন্য এই সতর্কতা। ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ভেতরে চুক্তেই দেখি সামনে উচু একটি টেবিল, তার ওপাশে বিশালদেহী কালো গার্জ দাঁড়িয়ে ভিজিটরদের ব্যাগ পরীক্ষা করে তারপর চুক্তে দিচ্ছে। এরকম ব্যবস্থাও এগারো সেপ্টেম্বরের পরেকার। আগে এমনিতেই সবাই চুক্তে পড়তে পারত। আমার কাছে কোনো ব্যাগ ছিল না। কনকের হাতের ক্যামেরা আর নাহিদের ব্যাগ পরীক্ষা করে ফেরত দিল। পারিসা ওর পুতুলটা গার্ডের হাতে তুলে দিল। এক গাল হেসে পুতুলটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে পুতুলটা আবার পারিসার হাতে ফেরত দিল। সকল স্টেটের রাজধানীতে গভর্নরের সরকারি ভবন অর্ধাৎ ক্যাপিটল বিল্ডিং আছে। সব কয়টি ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে একটি মিউজিয়াম আছে, স্টেটের সকল ইতিহাস সম্পর্ক্যুক্ত দলিলপত্র এ মিউজিয়ামে রাখা আছে। মিউজিয়াম দেখা শেষ করে যখন বের হয়ে আসি তখন এই গার্জ পারিসাকে আবার আদর করে ধন্যবাদ জানাল। সর্বত্তই একটি ব্যাপার দেখছি ওরা বাচ্চাদের খুব গুরুত্ব দেয়। বাচ্চাদের ভুলের জন্য বা অপরাধের জন্য মা বাবাকেই সতর্ক করে দেয়। কনকের বাসায় দাওয়াতে ওর বন্ধুরা বড় বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিল। ঘর ভর্তি সব লোকজন সবাই গল্পগুজব করছে। ওদিকে বাচ্চারা মহানন্দে হৈ টে লাফালাফি করছে। কয়েকজন বিছানার ওপর, কয়েকজন মেঝেতে লাফাচ্ছে। খেলাধুলার পরিস্থিতি প্রথমে হাসাহাসি লাফালাফি, তারপর হৈ টে এরপর মারামারি এবং চিৎকার কানাকাটি। একজন তো আবার বাথরুমের মধ্যে আটকা পড়ে চিৎকার। বাচ্চাদের মায়েদের হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা আয়তে এল এবং কিছুটা শান্ত হল। খেয়াল করলাম সকল মা নিজ বাচ্চাকে বকা দিল, অন্য বাচ্চার ওপর দোষারোপ করল না। একজন মাকে বলতে শুনলাম, ইস, ছেলেটা খুব দুষ্ট হয়েছে, আমাকে একেবারে পাগল করে ছাড়ে। একেক সময় মনে হয় চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু ভয়ও লাগে কখন পুলিশের কানে যায় তখন আবার কি করবে কে জানে। শুনলাম, এ দেশে নাকি কোনো বাচ্চা মায়ের অবহেলার কানে দুর্ঘটনায় পড়লে সেই মাকেই একবার দুইবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তৃতীয়বার একই ঘটনা ঘটলে বাচ্চাকে মায়ের নিকট থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

কারণ নাকি এর মধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে এই মা বাচ্চা লালন পালন করার উপযুক্ত নয়। আরো কিছু বিষয়, আগেও আমি শনেছি, এখন বাস্তবে দেখলাম। মায়ের হাতের কাছে এমন কেউ থাকে না যার কাছে বাচ্চাকে এক দণ্ড দিয়ে ঘরে সংসারে বা বাইরের কোনো কাজ করা যায়। একটি পর্যায়ে এসে মোটামুটি ডে-কেয়ার সেটারে বাচ্চাকে দিয়ে রেখে চাকুরিজীবী মাকে চাকুরিতে যেতে হয়, উপায় নেই। বাচ্চার জীবনের সবচেয়ে প্রধান যে বিষয় মা বাবার সান্নিধ্য বাচ্চারা তা থেকে বর্ণিত হয়। আঠারো বছর বয়স হয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের জোর করে মা বাবার কাছে রাখা যাবে না। আমাদের দেশে পরিবার প্রথা যে কত বড়ো আশীর্বাদ এখানে এসে তা বোঝা যায়। মানুষের জীবনের প্রধান যে ইনসিটিউশন পরিবার এখানে তা তেঙ্গে ফেলি হচ্ছে। মানুষের জীবনের এ প্রধান ইনসিটিউশন গুরুত্বহীন করে তুলে সেখানে নতুন নতুন এজেন্সী গড়ে উঠছে, কিন্তু পরিবারের কোনো বিকল্প সৃষ্টি হতে পারেনি। এর ফলে কি হচ্ছে, বৃক্ষ মা বাবা ওল্ড এজ হেমে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ধূকচে আর ইয়ং জেনারেশন নিজেদের সৃষ্টি বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। এখানে কিছু বয়েসী আমেরিকান মহিলার সঙ্গে আলাপচারিতার ফলে এ বিষয়ে আমি আরো নিশ্চিত হলাম। ব্যক্তিস্বত্ত্ববোধ ভালো কিছু যেখান থেকে তা সৃষ্টির পরিবর্তে ধর্ষনের দিকে নিয়ে যায় সেখানেই থেমে যাওয়া দরকার। গ্লোবালাইজেশনের কারণে বাংলাদেশেও সমাজের ওপরের তলায় কোথাও এ ব্যাধি শুরু হয়ে থাকতে পারে। এ রোগ থেকে সুজির পথ রয়েছে আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে, আমাদের সমাজের বড়ো অংশকে এগুলো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে, কিছু সুফলের দেখাও মিলেছে। বৃহত্তর জনগণকে এখনো একারণে বিপথে নিতে পারেনি।

অঙ্গিনে একদিন রাতের বেলায় একটি ফ্লাইওভারের নীচে দেখলাম সাদা চামড়ার একজন আমেরিকান প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাকার্ডে লেখা আছে, আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধে চার বছর জেল খেটেছি, তোমরা আমাকে সাহায্য কর। কনক তাকে এক ডলার দিল। লোকটির মুখে দাঁড়ি, খুব দূর বোঝা যায়। এক ডলার পেয়ে দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, গড রেস ইউ। এ লোকটিকে আরো কয়েকবার দেখেছি। আজকাল এভাবে ভিক্ষা করাটা নাকি বেশ বেড়ে গেছে। নাহিদের যুক্তিটা হয়ত ঠিক, আমাদের যত থার্ড ওয়ার্ল্ড দেশের লোকেরা এখানে এসে অড জব করে সংসার চালাচ্ছে, লেখাপড়া করছে, আর এরা পারে নাঃ একদিন একজন মহিলাকেও দেখলাম এভাবে ভিক্ষা করতে। কনক একটি মজার ঘটনার কথাও বলল। ওর অফিসের কাছেই ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে গাড়ি থামলে প্রায়ই একজন কালো হোমলেস, আমাদের দেশে যাদের ভিক্ষুক বলি, কনকদের কাছে এসে ভিক্ষা চাইত। শীতে তার কাঁপুনি দেখে একদিন কনক তার জ্যাকেটটি ওকে দিয়ে দিয়েছিল। মনে হয় সে জন্যই লোকটি কনককে মনে রেখেছে। কিছুদিন পর যথারীতি ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে কনক গাড়ি থামিয়ে বসে আছে। কনককে চিনেই লোকটি এগিয়ে এসে বলল, আমি এখন কাগজ বিক্রি করি। আরো একদিনের ঘটনা। কেনাকাটা করার জন্য আমরা শাহী দোকানে গেছি, সেই সময়ে একজন হোমলেস এসে বলল, তোমরা কেউ আমাকে কি একটি সুপ কিনে দিতে পার? সত্য বলতে কি, দোকানের লোকজন কোনোদিন এভাবে সাহায্য করবে না। কারণ একদিন কিছু দিলে প্রতিদিন হোমলেসরা এসে বিরক্ত করবে। কনক তাকে কিনে দিল। এ

অভ্যাসটি কনকের বরাবরের। দেশে থাকতেও কনক এরকম অনেকবার করেছে। আজ দোকানে মহিলাটি একাই আছে। সেকারণে মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছে। কনককে ডেকে বলল, আমার হাসব্যান্ড অসুস্থ তাই দোকানে আসতে পারেনি। তোমরা যদি একটু অপেক্ষা কর তাহলে আমি দোকান বন্ধ করে চলে যেতে পারি। মহিলা দোকান বন্ধ করে গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত আমরা আমাদের গাড়িতেই বসে থাকলাম। এরকম টুকরো কথা টুকরো সৃষ্টি আরো অনেক আছে। আমার মনে হল, প্রদীপের নীচে অঙ্ককার এটা কেবল কথার কথা বা বইয়ের কথা নয়। আমেরিকা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উচ্চতম বিকাশ হয়েছে এখানে। সবাই যে এক রকম বিভ্বান তা নয়, তবে বিভ্বানের সংখ্যা হ্যাত বেশি। চতুর্দিকে প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ে। এসবের পাশেই আবার হোমলেস, আমাদের দেশে যাদের ভিক্ষুক বলি ফকির বলি এখানে তারা হোমলেস। হোমলেস শব্দটি দিয়ে ভিক্ষার কথা ঢেকে দেয়া হয়েছে তবে হোমলেসদের ভিক্ষার প্রয়োজন তাতে শেষ হয়নি। হলিউডের সিনেমার মত বা টেলিভিশনের কোনো সিরিয়ালের মত সাজানো বড়ো অপরাধ দেখিনি, তার অর্থ অপরাধ নেই সেরূপ মনে করা ঠিক হবে না। অপরাধের বাস্তবতার সঙ্গে কিছু যুক্ত করে হয়ত সিনেমার কাহিনীগুলো তৈরী। ছোটো অপরাধ কম নেই, শাহী দোকানের মালিক এ মহিলা আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে দোকান বন্ধ করল হ্যাত ছোটো অপরাধের ভয়েই।

সতেরো তারিখে ছিল সোমবার। কনক অফিস থেকে এসেই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভাষণ শোনার জন্য টিভি খুলে বসেছে। অঠিনের সময় সক্ষ্য সাতটায় প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুরু হল। ভাষণের সারমর্ম হল ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাবার জন্য, তা না হলে যুদ্ধ শুরু হবে। আমার প্রচণ্ড টেনশন শুরু হল। এ আটচল্লিশ ঘণ্টা অর্থাৎ দুই দিনের কিছু পরে আমাকে দেশে ফিরতে হবে, সেভাবেই ব্যবস্থা হয়ে আছে। ফিরব একা তার ওপর দুবাই হয়ে, ইরাকে যুদ্ধ শুরু হলে দুবাই যুদ্ধ জোনের মধ্যে কিংবা তার কাছাকাছি পড়বে হ্যাত। যুদ্ধ ইস্যুতে বিশ্ব জনমত ইতিমধ্যেই বিভক্ত, নিউজিল্যার শক্তিধর বিভিন্ন দেশ পৃথক শিবিরে। যুদ্ধ যদি ছাড়িয়ে পড়ে আমেরিকায় আমাকে কতদিন আটকে পড়তে হয় কে জানে। ছেলের কাছে আছি, খেলার সাথী পারিসা আছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। পেছনে দেশেও তো অর্ধেক ছেড়ে রেখে এসেছি। আমি যখন আমেরিকায় তখন আমার ছোটো ছেলে শোভনের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। প্রেভন বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছিল। ছোটো মেয়ে শাওলও বুয়েটে ম্যাট্রিয়াল ও মেটালর্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী, তারও লেভেল ওয়ান টার্ম টু-এর ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। সেভাবেই ওদের রেখে এসেছিলাম। এতদিনে ওদের দুজনেরই পরীক্ষা শেষ হয়েছে, খবর পেয়েছি। রোজকার রান্নাবাড়া ঘরদোর গোছগাছ করে রাখার প্রশ্ন আছে। যুদ্ধের সংবাদে তাদেরও টেনশন হবে যে আমি অনিষ্টিত সময়ের জন্য এখানে আটকে যেতে পারি। আমার ফেরার দিনক্ষণ সব প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেকারণে ফেরার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছি। কারণ শোনার সঙ্গেই কনক KLM এয়ারলাইন্স এর অফিসে ফোন করে জানতে চাইল

যাবে না। আমি তাতেই সম্ভত হয়ে গেলাম। কারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে কোথায় কিভাবে আটকে যাই কে জানে। আমি ফেরার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি এরকম সময়েই যুদ্ধের প্রায়তরা চলছে। আমার ফেরার পথের সেনসিটিভ এলাকায় যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। আমি আবার মনে মনে প্লেন হাইজ্যাক হবার ভয় পাচ্ছিলাম। সেটা খুবই সম্ভব, কেননা মেদারল্যান্ড সম্ভবত যুদ্ধ শিবিরের পক্ষ নিয়ে ফেলেছে। বাধ সাধাল ট্রানজিট ভিসা। কনক মেদারল্যান্ড দৃতাবাসের সঙ্গে কথা বলল কারণ আমাকে আমস্টারডামে ট্রানজিট হয়ে যেতে হবে। এসেছিলামও এ পথেই। দৃতাবাস কনককে জানাল আমার অবশ্যই ট্রানজিট ভিসা লাগবে। দৃতাবাসকে জানালো হল, আমি বিমানবন্দরের বাইরে বের হব না, তাছাড়া আমেরিকায় আমার সময় তো ট্রানজিট ভিসা ছাড়াই এসেছি। সব শুনে ওরা বলল, আসার সময় দুবাই বিমানবন্দর এ কাজটি করেছে। অর্থাৎ তারা আমাকে খাতির করেছিল কিন্তু ফেরার সময় হিউস্টন বিমানবন্দর কোনো ছাড় দেবে না। আমার ফেরার নিরাপত্তা নিয়ে কনকের টেলিশন ছিল অ্যান্ট বেশি। হিউস্টনে মেদারল্যান্ড দৃতাবাসের যে অফিস আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কনক সব ব্যবস্থা করল। তারা জানাল, কোনো অসুবিধা হবে না। আমার পাসপোর্ট ফেডেক্স করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে একই পদ্ধতিতে তারা পাসপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। KLM-য়ে আবার নতুন করে বুকিং দেয়া হল। ভিসার জন্য নতুন করে ছবিও তুলতে হল। ভিসা ফরম পূরণ করে ফটো ও পাসপোর্ট একত্রে ফেডেক্স করে পাঠিয়ে দেয়া হল। তারা বলেছিল সব কাজ শেষ করে পাসপোর্ট হাতে পেতে তিন দিন সময় লাগবে। আমি ঠিক দুই দিনের মধ্যে ট্রানজিট ভিসাসহ পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব কয়টি দেশের ভিসা দেয়া হয়েছে আমাকে।

সান্দাম হোসেনকে আটচল্লিশ ঘটনা সময় দেয়া হয়েছে। বিশ তারিখের আগে সে সময় পার হয়ে যাবে, এর অর্থ বিশ তারিখের দিকে যুদ্ধ শুরু হতে পারে। এ অবস্থায় বাইশ মার্চ আমার যাওয়া ঠিক হবে না। অন্ততপক্ষে সঙ্গাহখানেক যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধ প্রকৃতই কোন দিকে মোড় নিতে পারে তা না দেখে রাস্তায় বের হওয়া যাবে না। কিছু সময় পার হলে বোৰা যাবে সামনে কি হতে যাচ্ছে। যুদ্ধ যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আপাতত যাওয়া বক্স রাখতে হবে। মোটাযুটি সব কিছু বিবেচনা করে আবার নতুন করে যাবার দিন ঠিক করা হল তিরিশ মার্চ।

মার্কিন ও বৃটিশ কোয়ালিশন সত্যই ইরাক আক্রমণ করল। আমার দেশে ফেরার তাগিদ ছিল বলে আমি হয়ত ইচ্ছা করেই আশা করেছিলাম যুদ্ধ হবে না। আজকাল এরকমও তো হয়। টেলিশনে যেভাবে দেখলাম তাতে মনে হয় যুদ্ধ এক তরফাই শুরু হল। আগের ঘোষণা মোতাবেক ইউটি অস্টিনের স্টেডেন্ট্রা ক্লাস বর্জন করে র্যালী বের করল। র্যালী ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের কাছে আসতেই পুলিশ বাধা দিল। র্যালী আর এগোয়ানি। যুদ্ধ শুরু হবার আগে বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে যেভাবে যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশ হচ্ছিল যুদ্ধ শুরু হবার পর তাতে যেন ভাটা পড়ল। এখন টেলিশনে নিউজ চ্যানেলগুলোতে যেসব সাক্ষাত্কার প্রচারিত হচ্ছে সেসবের মর্মার্থ একটই, আমাদের সৈনিকদের পেছনে আমরা আছি। যুদ্ধের আগের দৃশ্যের সঙ্গে এসবের মিল নেই। বোৰা শেল, যুদ্ধ বিরোধিতার কারণ ইরাকের জনগণের প্রতি সহানুভূতি নয়। মূল কারণ হচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েদের যুদ্ধে না

পাঠানো।

এক সঙ্গাহ ধরে যুদ্ধ চলছে আমি এখানে আছি। দেখছি সকল টেলিভিশন চ্যানেলে যুদ্ধের একই খবর, কিন্তু প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে। সান্দাম হোসেন ইরাকের টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেছে। এখানে এটা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে এটা কি প্রকৃত সান্দাম হোসেন অথবা তার ড্রপিকেট? সারাদিন সব কয়টি চ্যানেলে একই ধরনের খবর প্রচার হচ্ছে লাগল। কিছুটা অবাকও হলাম, অন্য দেশের মাটিতে শত শত বেসামরিক নারী পুরুষ শিশু যুদ্ধে মারা যাচ্ছে কিন্তু এখানে যুদ্ধের কোনো আলাদাত নেই এখানে যুদ্ধ কেবল টেলিভিশনের পর্দায়। টেলিভিশনে দেখে ঠিক বোৰা যায় না এটা কোনো আসল যুদ্ধের ছবি নাকি হলিউডে তৈরী কোনো সিনেমায় যুদ্ধের অ্যাকশন দৃশ্য। এভাবে যুদ্ধ দেখে দেখে জনগণ বিরক্ত হয়ে গেছে। টেলিভিশনের খবরে বলল, জনগণ এসব যুদ্ধ দৃশ্যের একমেয়েমি কাটনোর জন্য এই উইক এতে বেশি করে শপিংমলে ঘুরে বেশি যুদ্ধ দৃশ্যের একমেয়েমি কাটনোর জন্য এই উইক এতে বেশি করে শপিং বিক্রি ও হয়েছে নাকি বেশি। আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকা মহাদেশকে দুপাশ দিয়ে এমনভাবে আগলে রেখেছে যে পৃথিবীর অন্যত্র যেসব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে সেসবের কোনো আঁচ কিংবা তাপ এখানে এসে লাগে না।

নয়।

এখনে পর্যন্ত ঠিক আছে আমি তিরিশ তারিখে চলে যাব তাই কনকের বন্ধুরা অনেকেই দেখা করতে এল। এই তিন মাসে তাদের সকলের সঙ্গে বেশ অ্যান্ট হয়ে উঠেছিলাম। সীমু অষ্টিনে কনকদের কাছাকাছি থাকে। সেকারণে সীমু এবং ওর বউ তন্নির সঙ্গেই দেখা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কনকদের সকল সামাজিক অনুষ্ঠানেই কনক আর সীমুকে একত্রে পেয়েছি, সীমুদের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। প্রবাস জীবনে বন্ধুরাই পরম আত্মীয় হয়ে ওঠে, বাস্তব কারণেই সেভাবে হতেও হয়। দেশে ফেরার আনন্দ যেমন ছিল তেমনি এদের সকলকেই যে ছেড়ে যাব সেকারণে মনটা খুব খারাপও লাগছিল। কয়েক দিন ধরে আড়ালে কান্নাকাটিও করেছিলাম। কান্তা আর জুয়েলকে ছেড়ে এসেছিলাম সেজন্যও মন খারাপ ছিল। তবু আমেরিকায় তো ছিলাম। দূরে, কিন্তু দেশে খাকার মত এতদূরে নয়। মন খারাপ বাড়ছিল, আজ আর কান্না আড়াল করতে পারলাম না। পারিসা স্যুটকেস গোছানো দেখেই বুঝতে পারল আমি আবার হয়ত কোথাও যাচ্ছি। কান্তাৰ বাসায় এভাবেই স্যুটকেস শুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন পারিসা সম্ভবত ধারণা করেছিল আমি বাংলাদেশে চলে গেছি। সাক্রামান্তোতে কান্তাৰ বাসা থেকে আবার যখন অষ্টিনে আমি বাংলাদেশে চলে গেছি। সাক্রামান্তোতে কান্তাৰ বাসা থেকে আবার যখন অষ্টিনে আমি বাংলাদেশে চলে গেছি। পারিসা এগুলো মনে ফিরে এলাম তখন পারিসার জন্য কিছু গিফ্টও নিয়ে এসেছিলাম। পারিসার এগুলো মনে ফিরে এলাম তখন পারিসার জন্য কিছু গিফ্টও নিয়ে এসেছি। এক ছিল। পারিসা বোধ হয় তেবেছিল বাংলাদেশ থেকেই তার জন্য গিফ্ট নিয়ে এসেছি।

যাচ্ছ পারিসা বারবার আমার হাত ধরে এবং ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, দাদু তুমি থাক, দাদু তুমি থাক। দাদু তুমি যাবে না। কি করব আমি, কি বলব পারিসাকে তা ঠিক বুবতে পারছিলাম না। মনে হল কলোরাডো নদীটি যদি আটলাস্টিকের বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশের পদ্মায় এসে মিশে যেতে পারত তাহলে খুব ভালো হত। যখন আমেরিকায় বেড়াতে আসছিলাম তখন কতদিন পরে এদের দেখতে পাব সেই আনন্দে বিভোর ছিলাম। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা এত দীর্ঘ পথ পাঢ়ি দিয়ে এসেছি, মোটেই খারাপ লাগেনি। এখন আমার ফেরার সময়, দেশে ফিরে যাচ্ছি, পেছনে পারিসাকে, কনক ও নাহিদকে, কাস্তা ও জুয়েলকে, তাদের সকলের নিকট বন্ধুদের রেখে যাচ্ছি। এখন মনে হল দেশে ফেরার পথ বড়ো বেশি দীর্ঘ, শেষ হতে চায় না। কনক আর নাহিদ আমার সুটকেস গুছিয়ে দিল। আমি চুপচাপ বসে দেখছিলাম, পারিসা আমার শরীর ঘেষে বসে রইল। কখনো আমার পাশে ঘুরে ঘুরে বলল দাদু তুমি যাবে না। তুমি থাক। রাত বারোটার দিকে শুয়ে পড়লাম। শুতে যাবার আগে কাস্তার সঙ্গে টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথা বললাম। কাস্তার মন্টাও বেশ ভারি হয়ে আছে। কাস্তা বলল, আমা তুমি ভাইয়ার কাছে থাকলেও আমেরিকার ভেতরেই ছিলে। তাই সাইকোলজিক্যালি মনে হত তুমি তো কাছেই আছ। ইচ্ছা করলেই তোমাকে দেখে আসতে পারব। বাংলাদেশে চলে গেলে মনে হবে কত দূরে তুমি আছ। সারা রাত বুকের মধ্যে অস্তির লাগছিল। বুবতে পারছিলাম পারিসার জন্যই বেশি খারাপ লাগছে। পারিসার পেছনে কলকের হাসি মুখ ভেসে ভেসে আসছে, নাহিদের চেহারা এবং কঠস্বর ভেসে আসছে, আশ্চা চল অমুক জায়গাটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। যেন কাস্তা বলছে, আশ্চা শোভন আর শাওনের দিকে খেয়াল রেখ, ওরা এখনো ছেটো। ভাইয়া আর আমিতো বড়ো হয়ে গেছি। যেন জুয়েল বলছে, আশ্চা আপনাকে আজ ফ্রেশ লাগছে, চলেন কোথাও বেড়িয়ে আসি। এরকম আরো কত কিছু মনের মধ্যে ঘুরপাক থাচ্ছে। কাস্তার কথাগুলো মনের মধ্যে বাজছে, ভাইয়া আর আমি তো বড়ো হয়ে গেছি। দেশে শোভন আর শাওনও মনে করে তারাও বড়ো হয়ে গেছে, তারা কেউ আর ছেটো নেই। আসলেই ছেলেমেয়েরা কবে কখন বড়ো হয়ে গেছে টের পাইনি। এক সময় সামান্য দূরে হলেও ওদের একা যেতে দেইনি, আমি সঙ্গে গেছি অথবা ওদের আবাৰা সঙ্গে গেছে। এখন কনক এবং কাস্তা দুই ভাইবোন বিদেশে, অনেক দূরদেশে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার চেয়ে ওদের আবাৰার সমস্যা বেশি হয়। ছেলেমেয়েরা মনে করে ওরা বড়ো হয়ে গেছে, এখন ছেটো নেই। ওদের আবাৰা মনে করে এখনো ওরা ছেটোই আছে। এখনো দেখি, ওদের কারো বাসায় ফিরতে একটু দেরি হলে ঘৰের মধ্যে অস্তির হয়ে ঘুরতে থাকে অথবা বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের যুক্তি হল নানান কারণেই একটু দেরি তো হতেই পারে। এগুলো নিয়েই আমাদের জীবন, সব কিছু ছবির মত মনের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। কাউকে এখনে ছেড়ে যাচ্ছি, আবাৰা দেশে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের জীবন হল এই আসা যাওয়ার পথের পরে, থেমে যাবার সুযোগ নেই। সকাল থেকে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে যায় বিকেল আসে তারপরেও চলার শেষ নেই। এভাবেই আমেরিকায় আমার তিন ঘাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে, কোথাও থেমে যাইনি। আরো কিছু কথা। আমেরিকায় আমার নিকটের এবং দূরের আঞ্চলিক পরিজন বন্ধু অনেকেই আছে। সকলের সঙ্গে সব সময় যে যোগাযোগের বা কথা বলার সুযোগ ছিল তা নয়।

এখনে এসে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ত হয়নি কিন্তু টেলিফোনে অনেক কথা হয়েছে। তাদের কথা না বললে আমার আমেরিকার কথাগুলো আসলে সম্পূর্ণ হয় না।

আমেরিকায় আমার বেড়াতে আসা, হয়ত প্রবাস জীবনও, সব মিলিয়ে হল তিন মাস আট দিন। ভালোভাবেই উপলক্ষ করেছি প্রবাস জীবনে টেলিফোন হল অন্যতম বড়ো বস্তু। সকলের সঙ্গেই অনেক অনেকবার কথা বলেছি, কখনো আমি টেলিফোন করেছি কখনো তারা করেছে। এখনকার টেলিফোন কোড নম্বর নিয়ে আমি প্রায়ই সমস্যায় পড়ে যেতাম। এখনে যারা থাকে তাদের সকলের টেলিফোন নম্বর আমার কাছে ছিল না, সংগ্রহ করতেও পারিনি। আমি যে আমেরিকায় এসেছি তা অনেকের জানা ছিল না, জান থাকার কথাও নয়। আমার বড়ো বোনের মেয়ে রিয়া থাকে শিকাগোতে, ওর স্বামী বাবুর এখনে কম্পিউটার সম্পর্কিত জব করে। বাবুর অনেকদিন হল আমেরিকায় এসেছে। রিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করে এসেছিল। কনকের ছেটো বেলায় রিয়া সুযোগ পেলেই কনককে কোলে পিঠে নিয়ে ঘুরত। কনক এবং রিয়া দুজনেই এখন আমেরিকায়, মনে হতেই ভালো লাগল। রিয়ার সঙ্গে কনকদের যোগাযোগ ছিলই, আমার যাবার ফলে যোগাযোগ আরো বাড়ল। এখন কথা হত প্রধানত আমার সঙ্গে। মজার ব্যাপার আমার মেজো বোনের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে তিন জনই আমেরিকায়, বড়ো মেয়ে বীথি এবং ছেটো ছেলে বিপুব দুজন হাওয়াইতে, ছেটো মেয়ে বিন্দু আগে মিনেসোটা ছিল এবং এখন রসেস্টার, জায়গাটি সম্ভবত নিউইয়র্কের নিকটে কোথাও। বীথি আমার বোনের মেয়ে আমি তার কাজল খালামা, তার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য পনেরো বছরের। আমার মেজো বোন বৈবী আপা, আমেরিকায় তিন ছেলেমেয়ের কাছে অনেকবারই আসা যাওয়া করেছে, থেকেছেও অনেক দিন। বীথির কথা বলছিলাম, যে কোনো কারণেই হোক বীথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো জব করে। বীথির সঙ্গে প্রায়ই আমার টেলিফোনে কথা হত, কখনো বীথি নিজেই করত আবাৰ কখনো আমি করতাম। আমি করতাম মানে কনকের বাসায় যখন ছিলাম কনক বা নাহিদ আমাকে বীথির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের কাজটি কাস্তা করে দিত। কাস্তার বাসায় যখন ছিলাম সেখানেও বীথি অনেকবার আমার কাছে টেলিফোন করেছে। কখনো কখনো বীথির সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি। বীথির ছেটো বোন, আমার মেজো বোনের মেয়ে বিন্দুর স্বামীর নাম মুনীর, আমেরিকা থেকে ম্যাথামেটিস্টে মাস্টার্স করেছে। পরে অফ্টেলিয়া থেকে পি-এইচ.ডি. করেছে। কিছুদিন আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছে এখন আছে রসেস্টারে, অধ্যাপনারত। বিন্দু কনকের চেয়ে প্রায় বছর দুয়েকের বড়ো, তাদের দুজনের সম্পর্ক প্রায় সহজের ছেটো বড়ো ভাইবোনের, একত্রে বন্ধুর মতও। বিন্দু যখনই সময় পেয়েছে আমাকে টেলিফোন করেছে, আমিও টেলিফোন করেছি। আমার চাচাতো বোনের ছেলে শামীম, আইওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ওর কথা আগেই লিখেছি। বিদেশ ভিত্তীয়ে শামীম হল কনক কাস্তার আপন বড়ো ভাই। আমার আমেরিকায় যাবার আগে শামীমের আবাৰা, আমাদের শামসুন্দিন দুলাভাইকে সঙ্গে নিয়ে শামীম আইওয়া থেকে সুন্দৰে ক্যালিফোর্নিয়াতে কাস্তার বাসায় এসে বেড়িয়েও গেছে। শামীম জুয়েলকে খুবই পছন্দ করে, আমাকে অনেকবার বলেছে।

যাছঁ! পারিসা বারবার আমার হাত ধরে এবং ঘুরে ঘুরে বলতে লাগল, দাদু তুমি থাক, দাদু তুমি থাক। দাদু তুমি যাবে না। কি করব আমি, কি বলব পারিসাকে তা ঠিক বুবতে পারছিলাম না। মনে হল কলোরাডো নদীটি যদি আটলান্টিকের বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশের পাইয়া এসে মিশে যেতে পারত তাহলে খুব ভালো হত। যখন আমেরিকায় বেড়াতে আসছিলাম তখন কতদিন পরে এদের দেখতে পাব সেই আনন্দে বিভোর ছিলাম। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, মোটেই খারাপ লাগেনি। এখন আমার ফেরার সময়, দেশে ফিরে যাচ্ছি, পেছনে পারিসাকে, কনক ও নাহিদকে, কান্তা ও জুয়েলকে, তাদের সকলের নিকট বস্তুদের রেখে যাচ্ছি। এখন মনে হল দেশে ফেরার পথ বড়ো বেশি দীর্ঘ, শেষ হতে চায় না। কনক আর নাহিদ আমার স্মৃটিকেস গুছিয়ে দিল। আমি চপচাপ বসে দেখছিলাম, পারিসা আমার শরীর ঘেষে বসে রইল। কখনো আমার পাশে ঘুরে বলল দাদু তুমি যাবে না। তুমি থাক। রাত বারোটার দিকে শয়ে পড়লাম। শুভে যাবার আগে কান্তার সঙ্গে টেলিফোনে কিছুক্ষণ কথা বললাম। কান্তার মন্টাও বেশ ভারি হয়ে আছে। কান্তা বলল, আমা তুমি ভাইয়ার কাছে থাকলেও আমেরিকার ভেতরেই ছিলে। তাই সাইকেলজিক্যাল মনে হত তুমি তো কাছেই আছ। ইচ্ছ করলেই তোমাকে দেখে আসতে পারব। বাংলাদেশে চলে গেলে মনে হবে কত দূরে তুমি আছ। সারা রাত বুকের মধ্যে অস্তির লাগছিল। বুবতে পারছিলাম পারিসার জন্মই বৈশি খারাপ লাগছে। পারিসার পেছনে কনকের হাসি মুখ ভেসে ভেসে আসছে, নাহিদের চেহারা এবং কর্তৃপক্ষ ভেসে আসছে, আমা চল অস্মক জায়গাটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। যেন কান্তা বলছে, আমা শোভন আর শাওনের দিকে খেয়াল রেখ, ওরা এখনো ছোটো। ভাইয়া আর আমিতো বড়ো হয়ে গেছি। যেন জুয়েল বলছে, আমা আপনাকে আজ ফ্রেশ লাগছে, চলেন কোথাও বেড়িয়ে আসি। এরকম আরো কত কিছু মনের মধ্যে ঘুরপাক থাছে। কান্তার কথাগুলো মনের মধ্যে বাজছে, ভাইয়া আর আমি তো বড়ো হয়ে গেছি। দেশে শোভন আর শাওনও মনে করে তারাও বড়ো হয়ে গেছে, তারা কেউ আর ছোটো নেই। আসলেই ছেলেমেয়েরা কবে কখন বড়ো হয়ে গেছে টের পাইনি। এক সময় সামান্য দূরে হলেও ওদের একা যেতে দেইনি, আমি সঙ্গে গেছি অথবা ওদের আবার সঙ্গে গেছে। এখন কনক এবং কান্তা দুই ভাইবোন বিদেশে, অনেক দূরদেশে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার চেয়ে ওদের আবার সমস্যা বেশি হয়। ছেলেমেয়েরা মনে করে ওরা বড়ো হয়ে গেছে, এখন ছোটো নেই। ওদের আবার মনে করে এখনো ওরা ছোটোই আছে। এখনো দেখি, ওদের কাঠো বাসায় ফিরতে একটু দেরি হলে ঘরের মধ্যে অস্তির হয়ে ঘুরতে থাকে অথবা বাইরে রাস্তার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের যুক্তি হল নানান কারণেই একটু দেরি তো হতেই পারে। এগুলো নিয়েই আমাদের জীবন, সব কিছু ছবির মত মনের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। কাউকে এখনে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার দেশে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের জীবন হল এই আসা যাওয়ার পথের পরে, থেমে যাবার সুযোগ নেই। সকাল থেকে দুপুর হয়, দুপুর গড়িয়ে যায় বিকেল আসে তারপরেও চলার শেষ নেই। এভাবেই আমেরিকায় আমার তিন মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে, কোথাও থেমে যাইনি।

আরো কিছু কথা। আমেরিকায় আমার নিকটের এবং দূরের আঘাত পরিজন বস্তু অনেকেই আছে। সকলের সঙ্গে সব সময় যে যোগাযোগের বা কথা বলার সুযোগ ছিল তা নয়।

এখনে এসে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ত হয়নি কিন্তু টেলিফোনে অনেক কথা হয়েছে। তাদের কথা না বললে আমার আমেরিকার কথাগুলো আসলে সম্পূর্ণ হয় না।

আমেরিকায় আমার বেড়াতে আসা, হয়ত প্রবাস জীবনও, সব মিলিয়ে হল তিন মাস আট দিন। ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি প্রবাস জীবনে টেলিফোন হল অন্যতম বড়ো বস্তু। সকলের সঙ্গেই অনেক অনেকবার কথা বলেছি, কখনো আমি টেলিফোন করেছি কখনো তারা করেছে। এখনকার টেলিফোন কোড নম্বর নিয়ে আমি প্রায়ই সমস্যায় পড়ে যেতাম। এখনে যারা থাকে তাদের সকলের টেলিফোন নম্বর আমার কাছে ছিল না, সংগ্রহ করতেও পারিনি। আমি যে আমেরিকায় এসেছি তা অনেকের জানা ছিল না, জানা থাকার কথা ও নয়। আমার বড়ো বোনের মেয়ে রিয়া থাকে শিকাগোতে, ওর স্বামী বাবর এখনে কম্পিউটার সম্পর্কিত জব করে। বাবর অনেকদিন হল আমেরিকায় এসেছে। রিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করে এসেছিল। কনকের ছোটো বেলায় রিয়া সুযোগ পেলেই কনককে কোলে পিঠে নিয়ে ঘুরত। কনক এবং রিয়া দুজনেই এখন আমেরিকায়, মনে হতেই ভালো লাগল। রিয়ার সঙ্গে কনকদের যোগাযোগ ছিলই, আমার যাবার ফলে যোগাযোগ আরো বাড়ল। এখন কথা হত প্রধানত আমার সঙ্গে। মজার ব্যাপার আমার মেজো বোনের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে তিন জনই আমেরিকায়, বড়ো মেয়ে বীথি এবং ছোটো ছেলে বিপ্লব দুজন হাওয়াইতে, ছোটো মেয়ে বিন্দু আগে মিনেসোটা ছিল এবং এখন রেস্টার, জায়গাটি সম্ভবত নিউইয়র্কের নিকটে কোথাও। বীথি আমার বোনের মেয়ে আমি তার কাজল খালাম্বা, তার সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য পনেরে বছরের। আমার মেজো বোন বেবী আপা, আমেরিকায় তিন ছেলেমেয়ের কাছে অনেকবারই আসা যাওয়া করেছে, থেকেছে অনেক দিন। বীথির কথা বলছিলাম, যে কোনো কারণেই হোক বীথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই নিকটের। বীথির স্বামী রবীন কম্পিউটার সাইক্স মাস্টার্স, কম্পিউটার সম্পর্কযুক্ত খুবই ভালো জব করে। বীথির সঙ্গে প্রায়ই আমার টেলিফোনে কথা হত, কখনো বীথি নিজেই করত আবার কখনো আমি করতাম। আমি করতাম মানে কনকের বাসায় যখন ছিলাম কনক বা নাহিদ আমাকে বীথির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিত, কান্তার বাসায় যখন ছিলাম যোগাযোগের কাজটি কান্তা করে দিত। কান্তার বাসায় যখন ছিলাম সেখানেও বীথি অনেকবার আমার কাছে টেলিফোন করেছে। কখনো কখনো বীথির সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি। বীথির ছোটো বোন, আমার মেজো বোনের মেয়ে বিন্দুর স্বামীর নাম মুনীর, আমেরিকা থেকে ম্যাথামেটিক্সে মাস্টার্স করেছে। পরে অক্সফোর্ড থেকে পি-এইচ.ডি. করেছে। কিছুদিন আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছে এখন আছে রেস্টারে, অধ্যাপনারত। বিন্দু কনকের চেয়ে প্রায় বছর দূরের বড়ো, তাদের দুজনের সম্পর্ক প্রায় সহোদর ছোটো বড়ো ভাইবোনের, একত্রে বস্তুর মতও। বিন্দু যখনই সময় পেয়ে আমাকে টেলিফোন করেছে, আমিও টেলিফোন করেছি। আমার চাচাতো বোনের ছেলে শামীম, আইওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ওর কথা আগেই লিখেছি। বিদেশ বিভুঁয়ে শামীম হল কনক কান্তার আপন বড়ো ভাই। আমার আমেরিকায় যাবার আগে শামীমের আবা, আমাদের শামসুদ্দিন দুলাভাইকে সঙ্গে নিয়ে শামীম আইওয়া থেকে সুদূরে ক্যালিফোর্নিয়াতে কান্তার বাসায় এসে বেড়িয়েও গেছে। শামীম জুয়েলকে খুবই পছন্দ করে, আমাকে অনেকবার বলেছে।

জুয়েলও শামীমকে খুবই পসন্দ করে, ওদের দুজনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে টেলিফোনে কথা হয়, শুনেছি। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই শামীম অনেকবার টেলিফোন করেছে, আমার সঙ্গে কথা ও হয়েছে। আমার খালাতো ভাইয়ের মেয়ে টিনার কথা আগেই বলেছি। টিনার সঙ্গেও আমার প্রায়ই কথা হয়েছে। আমার চাচাতো বোন ফনা বুবু, আমার অনেক বড়ো, আমার মাস দুয়েক আগে নাতনীর বাসায় বেড়াতে এসেছে। নাতনী সানফ্রান্সিসকো থাকে। বুবু সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় স্থায়ীভাবে থাকে। এখানে যখনই বুবুর ভালো লাগত না আমাকে টেলিফোন করত। আমিও করতাম। আসলে আমাদের দু'জনেরই এখানে ভালো লাগা না লাগার অনেক সময় কেটেছে টেলিফোনে গল্প করে। বুবুর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে আমেরিকায় আছি তা প্রায় ভুলেই যেতাম, কখনো মনে হত সিরাজগঞ্জে আছি, পুরাণো স্থূতির মধ্যে ফিরে গেছি। একদিন সত্যিই বিস্মিত হলাম নীলার টেলিফোন পেয়ে। নীলা মনু ভাইয়ের স্ত্রী এবং ফনা বুবুর জা, আমার ভাবীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমারও বন্ধু। সে আমার যোগাযোগের টেলিফোন নম্বর ফনা বুবুর কাছ থেকেই নিয়েছিল। স্বামী মারা যাবার পর নীলা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমেরিকায় চলে এসেছিল, জানতাম। ছেলেমেয়ে এখানেই পড়াশুনা করেছে। নীলার টেলিফোন পেয়ে প্রথমে বিস্মিত হলাম, বিশ্ব কেটে গেলে খুবই খুশি লাগল। নিকটের এবং দূরের আরো অনেকেই এখানে আছে, সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারেনি। আমার ঘনিষ্ঠ আপনজনদের মধ্যে কাস্তা এখন পর্যন্ত সবার শেষে, বছরখানেক হল আমেরিকায় এসেছে। প্রায়ই সকলের ছোটো সে কথা চিন্তা করে হয়ত সকলে নিয়মিত কাস্তার কাছে টেলিফোন করে খোজখবর নিয়েছে, কাস্তাকে সান্নিধ্য দান করেছে। এতে কাস্তার একাকিত্ব কেটে গেছে। কনক কাস্তা দুজনেই বেশ সোশাল, যোগাযোগ রাখে। শামীম বছর ঘোলো হবে আমেরিকায় আছে। আমেরিকায় শামীমের প্রথম ইদের অভিজ্ঞতা খুব কঠোর। শামীম তখন এম. এস. করছে। বলল শামীম, ইদের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর প্রফেসরের সঙ্গে কাজ করেছে আর শামীমের বউ রুবিনা একা একা কানাকাটি করে ইদ পার করেছে। এরপ অভিজ্ঞতার কারণেই শামীম আমেরিকায় কাস্তার প্রথম ইদ কেমন কাটছে সে ব্যাপারে খোজ খবর নিয়েছে। কাস্তা প্রায়ই বলে, আমেরিকায় যারা যেখানেই থাকি না কেন টেলিফোনে কথা বললে মনে হয় কাছেই আছি। আমরা কেউ দূরে নই, দূরেরও নই। কনকদের বন্ধুরা কাস্তাদের বন্ধুরা আমার আঝীয় পরিজন যারা আমেরিকায় আছে এতদিন তাদের কারো কারো সামনে পেয়েছি, বাকিদের টেলিফোনে পেয়েছি। আমার প্রবাসের দিনগুলো তারাই ভরিয়ে রেখেছিল, আমার একাকিত্ব খুবতে দেয়নি। আমার ফেরার সময় হল, মনও সেভাবে প্রস্তুত হয়েছে। দেশে আমার জন্য অপেক্ষা করছে শোভন, শাওন, ওদের আবৰা, আমার মা এবং অন্যান্য আঝীয় পরিজন। দেশে ফেরার অর্থ হল এখানে যারা আছে তাদের ছেড়ে যেতে হবে। আবার কবে তাদের সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। আল্লাহ সকলেরই মঙ্গল কর্ম।

সকাল আটটার সময় হিউস্টনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কনক ড্রাইভিং সৈটে পাশে নাহিদ, পেছনে পারিসা আমার পাশে বসে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে হিউস্টন বিমানবন্দরে এসে পৌছালাম। যেদিন আমেরিকায় এসেছিলাম সেদিন এই চেনা পথ দিয়েই অস্তিনে যাই। সেদিন আকর্ষণ ছিল পারিসা কনক নাহিদ কাস্তা জুয়েল সকলেই। আজ ওদের ছেড়ে

যাচ্ছি। তখন মনের অবস্থা এক রকম ছিল, আজ কেমন ক্লান্ত লাগছে। চারপাশের দৃশ্যগুলো দেখলাম, সব কিছু পার হয়ে যাচ্ছি, কিছুই মনকে টেনে রাখছে না। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি পারিসার দিকে, দুজনের চোখে চোখ পড়ছে, পারিসা কি বুঝতে পারছে আমি কোথায় কত দূরে যাচ্ছি?

হিউস্টন বিমানবন্দরের সব রকম আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে দেখা গেল স্যুটকেসে নাকি তালা লাগানো যাবে না, কোনো প্যাকেজ টেপ বা দড়ি দিয়ে স্যুটকেস বাঁধা যাবে না। এরকম নিয়ম আগে ছিল না। কনককে বললাম, স্যুটকেসে তালা না থাকলে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌছানোর পর কেবল খালি স্যুটকেসটি পাওয়া যেতে পারে। কনকের কথার উভরে কাউন্টারের মহিলা বলল মালপত্র ক্ষয়ন করার পর প্রয়োজনবোধে স্যুটকেস খুলতে হতে পারে এজন্য তালা লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে। কনক তাকে বলল, আমাদের স্যুটকেসে তালা লাগানো থাকুক, যদি তেমরা প্রয়োজন মনে কর তালা তেপে স্যুটকেস চেক করতে পার, আমাদের তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না। আর আপত্তি করল না। আমার স্যুটকেসটি কেবল তালা লাগানো, কোনো প্যাকেজ টেপ বা দড়ি বাঁধা ছিল না। পাকিস্তানী এবং ইতিয়ান যাত্রীসহ বেশির ভাগ যাত্রীর মালপত্র স্যুটকেস প্যাকেজ টেপ আর দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাধা, কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ি কাটাকাটি শুরু হল। সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে লাউঞ্জে এসে বসলাম। কনক ওখানে বসেই ঢাকায় আমাদের বাসায় টেলিফোনে আমার দেশে ফেরার বিষয়ে সর্বশেষ খবর জানিয়ে দিল। আমেরিকায় আমাদের নিকট আঝীয় স্বজন যারা আছে নাহিদ একে একে সকলের কাছে টেলিফোন করে কথাও বলিয়ে দিল। কাস্তা এবং জুয়েলের সঙ্গে আমি কথা বললাম, টেলিফোনেই ওদের দুজনের কাছ থেকে বিদ্যায় নিলাম। আমি বারবার খেয়াল করছিলাম কোনো বাংলাদেশী সহযাত্রী পাওয়া যায় কিনা। না, একজন বালাদেশীকেও দেখলাম না। তবে অনেক পাকিস্তানী এবং ভারতীয় যাত্রীর দেখা পেলাম। একজন বয়ক মহিলা নাহিদের পাশে এসে বসল তারপর নাহিদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। বোবা গেল মহিলা কানে কম শোনে। নাহিদ আমার ডান পাশে বসে ছিল। নাহিদ উচ্চ কঠে মহিলার কয়েকটি কথার জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি আমার বাম পাশে এসে বসল। বলল, আমা এ মহিলা যদি আপনার পাশে এসে বসে তাহলে আপনার খবর আছে। নাহিদের কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

দুপুর দুইটায় প্লেন ছাড়বে। ঠিক একটার সময় যাত্রীদের লাইনে এসে দাঁড়ালাম। সেই একইভাবে চেক করল। এক্সেল্টর দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি। একবার ভাবলাম পেছনে তাকাব না কিছু পারলাম না। নিজে থেকেই সুখটা যেন ঘুরে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার আমেরিকায় আসার সময়কার একই দৃশ্য। কনক আর নাহিদের মাঝখানে ছোটো একটি মুখ অবাক হয়ে কেবল হাত নাড়ে। সেবার ছিল আমার আমেরিকায় আসার সময় এখন সময় হল যাবার। সেবার ওরা এসেছিল আমাকে রিসিভ করতে, এবার বিদায় দিতে। ওদের ছেড়ে যাচ্ছি, মেঘ জমে ছিল আমার মনে। পেছনে রেখে আসা অনেক টুকরো পেছনে কথা আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। এ কয়দিন আমি ছিলাম কনকের টুকরো কথা আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। আমি শুয়ে আছি শুমত পারিসাকে আমার পাশে এনে শুইয়ে জন্য কনক কত কিছু করেছে। আমি শুয়ে আছি শুমত পারিসাকে আমার পাশে এনে শুইয়ে

দিয়েছে। রাস্তার চলতে ভালো বুনো ফুলের গাছ দেখলে গাড়ির গতি কমিয়ে আমাকে দেখিয়েছে, ভালো পাখি থাকলে আমাকে দেখিয়েছে, কোথাও আমার কৌতুহল হলে কনক তা এড়িয়ে যায়নি। কেনাকাটা খাবারদাবার সব ক্ষেত্রেই কনক যেন পিংগৃহে বেড়াতে বানেওরে আসা তার বড়ো মেয়ের ইচ্ছাপূরণ করেছে। বাবার মনে হল কান্তার কথাও, শুধু আমি যদি খুশি হতে পারি কান্তা কীই না করল। পারলে কনক এবং কান্তা দুজনেই আমার জন্য আকাশের চাঁদও এনে দিতে পারত, যদি আমি চাইতাম। আজ বাসায় ফিরে এবং হয়ত সামনেও অনেক দিন পর্যন্ত পারিসা ঘরের মধ্যেই দাদু দাদু বলে আমাকে খুঁজে বেড়াবে, হাইড এড সীক খেলার জন্য সে লুকাবে কিন্তু তার মত শিশু হয়ে তাকে খোঁজার কেউ থাকবে না। দিন চলে যাবে, পারিসা আমার মনের মধ্যেই বড়ো হতে থাকবে। আবার কখনো পারিসাকে নিশ্চয়ই দেখব, হয়ত তখন দেখব পারিসা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। কনকরা ফিরে যাবে সে পথ দিয়েই আমাকে যে পথ দিয়ে হিউটনে নিয়ে এসেছিল। কনকের গাড়ির পেছনের সীটে পারিসা বসে থাকবে, কেবল আমি থাকব না।

আমি এখন প্লেনে ঝাঁপ্তার প্রস্তুতি নিছি। আমেরিকায় আসার সময় যেভাবে চেক করেছিল এখনো সেভাবে চেক করল। আমার সামনে লাল শেলোয়ার কারিজ পরিহিত মহিলা, এ ফ্লাইটের যাত্রী। ডিউট্রিত অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করল তোমার কাছে কত ডলার আছে। তার কাছে পাঁচশো ইউএস ডলার ছিল। ডিউট্রিত অফিসার মহিলাকে আরেকটি কর্ণার দেখিয়ে বলল ওখানে গিয়ে ডলারগুলো দেখো। আমি আমার পাসপোর্ট তার হাতে দিলাম। আমার পাসপোর্ট খুলে দেখে তারপর আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, সোজা প্লেনে উঠে যাও। যথারীতি প্লেনে উঠে সীট দেখে নিয়ে বসলাম। কোথাও কোনো সমস্যা হয়ত ছিল, সেকারণে প্লেন ছাড়তে নির্দিষ্ট সময়ের পরে দুই ঘণ্টা লেট হল। আসার সময় নাহিদ আমাকে বাংলা ম্যাগাজিন দিয়েছিল সেটা বেশ কাজে লাগল। উল্টো পাটে দেখতে বেশ সময় কেটে গেল। প্লেন ছাড়ল বিকেল চারটের সময়। প্লেন লেট হবার কারণে পাইলট দুঃঘৎকাশ করল। তবে যাত্রীদের আশ্চর্ষ করল যে আমরা আট ঘণ্টার মধ্যে আমস্টারডাম পৌঁছে যাব। তার মানে যে দুই ঘণ্টা লেট হয়েছে তা পুরুয়ে নেয়া হবে। প্লেন টেক অফ করল, আকাশে উড়ল, বুবলাম আমরা আমেরিকার সীমান্তের মধ্যে আছি, আমেরিকার মাটিতে আর নেই। হে আমেরিকা বিদ্যা, গুড বাই টু ইউ। তোমার এখানে আমার কত মধুর সূতি পড়ে থাকল, এখানে আমার পারিসা থাকল, ছেলে মেয়েরা থাকল, আঞ্চলিক পরিজনও কত থাকল। আবার কখনো হয়ত আসব, তোমাকে জানার তৃষ্ণা নিয়ে আসব, আবার দেখা হবে তখন।

আমার পাশের দুটো সীট খালি, একেবারে জানালার পাশে একজন কালো ভদ্রলোক বসে। আশে পাশের যাত্রীরা নামান দেশের, নামান রঙের। ফ্লাইট হিলাম তাই সারাটা পথ প্রায় ঘূর্মিয়েই কাটল। কখন আমেরিকার সীমান্ত পার হয়ে এসেছি বলতে পারব না। নাতনী ও ছেলেমেয়েদের পেছনে ছেড়ে এলাম, একত্রে আমেরিকাও পেছনে ছেড়ে এলাম। কনক কান্তারা এখন কি করছে? পারিসা? পারিসা হয়ত তার বাবার কাছে প্রশ্ন করতে পারে, বাবা দাদু কোথায়? ওর বাবা কি উত্তর দেবে? উত্তর দেবে হয়ত, দাদু নেই। দাদু এখন বাংলাদেশের পথে। সেখানে তোমার চাচা আছে, ফুফু আছে, দাদা আছে, তাদের কাছে যাচ্ছে। আবার কখনো হয়ত আসবে তোমার কাছে। দশ ঘণ্টার পথ ঠিকই আট ঘণ্টায়

পাড়ি দিয়ে প্লেন আমস্টারডাম বিমানবন্দরে এসে নামল। আমার ঘড়িতে তখন বাজে বারোটা, এটা আমেরিকার সময়। নাহিদ আমাকে আগেকার সময়ই রেখে দিতে বলেছিল, কারণ বাংলাদেশে পৌছানোর পর সময় আবার ঠিক হয়ে যাবে। পার্থক্য শুধু হবে দিন আর রাতের, সত্ত্বিহ তাই। একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এখানে এখন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা। পরের ফ্লাইটের গেইট নম্বর জানা ছিল তাই নির্দিষ্ট টার্মিনালে এসে গেইট খুঁজে বের করে লাউঞ্জে কিংচুক বসে থাকলাম। এখানে ছয় ঘণ্টার বিরতি। এই একই গেইটে আমাদের ফ্লাইটের আগে অফিকার কোনো একটি দেশে আরেকটি প্লেন ছাড়বে। সেই ফ্লাইটের যাত্রীরা অপেক্ষা করছে। ইউটন থেকে আসার পথে আমার একই সারিতে বসেছিল যে কালো ভদ্রলোকটি তাকেও এখানে দেখলাম এ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছে। আস্তে ধীরে হাত মুখ শুরে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। একা একাই শুরে ডিউটি ফ্রি শপগুলো দেখছি। কোনোটি কচকলেটের দোকান, কোনোটি কসমেটিকসের, আবার কোনোটি খেলনার দোকান। শুরতে শুরতে একটি দোকানের সামনে এসে দেখি সেখানে নেদারল্যান্ডের পরিচয় বহনকারী বিভিন্ন ধরনের জিনিস সাজানো আছে। হাঁটৎ মনে হল আমি এখন ইউরোপে, আমেরিকা ছেড়ে এসেছি অনেক আগে, এশিয়াতে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষা করছি। ভাবলাম, ইউরোপ থেকে আমার দুই বেয়ানের জন্য কিছু একটা গিফ্ট কিনে নিই না কেন। কিন্তু কি কিনব কিছুতেই তা ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষেষ কাউটারে দাঁড়ানো মেয়েটিকে বললাম দেখ, আমার বয়েসী আমার দুইজন আঞ্চীয়ার জন্য আমি দুটো গিফ্ট কিনতে চাই। তুমি কি আমাকে হেলপ করতে পারবে? মেয়েটি খুব উৎসাহের সঙ্গে খুঁজে পেতে একই রকম মাঝারি ধরনের দুটো ফুলদানী এনে দিল। ফুলদানী দুটোর গায়ে নেদারল্যান্ডের পরিচিত দৃশ্যের ছাপ আঁকা। আমার পছন্দ হল। সুন্দর করে প্যাক করে দিতে বললাম। আমার টিকেট দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল যে আমি কোন ফ্লাইটের যাত্রী ইত্যাদি। তারপর ইউরোকে ডেলারে কনভার্ট করে দামটা জানাল। দাম চুকিয়ে দিয়ে তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার লাউঞ্জে এলাম। ততক্ষণে আমাদের আগের ফ্লাইটের যাত্রীরা একে একে প্লেনে উঠে যাচ্ছে। একজন মহিলা আবার দূর থেকে আমাকে দেখে কাছে এল এবং আমাকে হ্যাত এ নাইস ট্রিপ বলে মৃদু হেসে চলে গেল। এভাবে আমাকে সম্মত করার একটি কারণ আছে। আমি সহজেই মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে পারি। আমাদের এসে পৌছানোর অনেক আগেই এ ফ্লাইটের যাত্রীরা এসে বসে আছে। ঠায় একভাবে বসে থাকা যেমন বিরক্তিকর আবার অথবা শুরে ঘুরে ক্লান্ত হবার কোনো অর্থ হয় না। আমি এসে দেখি অনেকেই বসে বসে বিমোচ্ছে। একজন আরেকজনের প্রায় কাঁধে মাথা রেখে শুমানোর চেষ্টা করছে, এভাবে ঠিক শুমানো যাচ্ছে না। যে সোফাটায় এসে বসলাম তার পাশেই একজন মহিলা বসে বারবার হাই তুলছিল আর ঘড়ি দেখছিল। আমি তাকে দুয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলে সেও আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। এরপর সামনের সোফায় বসে থাকা মহিলা দুইজনও আমাদের আলাপে যোগ দিল। তারপর দেখা গেল ওদের সকলেরই ঘুম ঘুম ভাব চলে গেছে। তারা নিজেরাই গল্পে মশগুল হয়ে পড়ল। এক ফাঁকে আমি উঠে গিফ্ট কিনতে চলে গিয়েছিলাম। মনে হয় আমি যতক্ষণ ছিলাম না ততক্ষণ ওর ভালোই গল্প করে কাটিয়েছে। সম্ভবত সেকারণে যাবার সময় মিষ্টি হাসি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেল।

এবার শুধু আমাদের ফ্লাইটের যাত্রীরা বসে আছে। তার মানে এখন আমাদের বিমানের পালা। এখানেও খুঁজে পেতে বাংলাদেশী কোনো সহযাত্রী পেলাম না। আশে পাশে যারা বসে আছে তারা সবাই পাকিস্তানী, তবে সবাই যে পাকিস্তান যাচ্ছে তা নয়। দুবাই পর্যন্ত সহযাত্রী, তারপর কেউ যাবে সৌদি আরব, কেউ কুয়েত, কেউ বাহরায়েন আবাব কেউ পাকিস্তান। আর আমি বাংলাদেশে। তবে সকলেই এসেছি আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে এই একটি ব্যাপারে যিল আছে। আমি উর্দু ভাষা সামান্য কিছু বুঝি, দ্বিতীয় বলতেও পারি। আশে পাশে বসে থাকা যাত্রীদের উর্দুভাষার কথোপকথন ভালোই বুঝতে পারছিলাম। সামনের সোফায় বসা লাল শেলোয়ার কামিজ পরা মহিলাটিকে দেখেই চিনলাম। উনি হিউটন থেকেই আমার একই ফ্লাইটের সহযাত্রী। এদের আলাপের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম আমেরিকা ছেড়ে আসার সময় বিমানবন্দরে যেভাবে পাকিস্তানীদের চেকিং করা হয়েছে সেটা স্থিতিগত অপমানজনক। প্রত্যেকে ভীষণভাবে বিরক্তি প্রকাশ করল। আসলে ইরাক যুদ্ধ ও হুর হুরার কারণে এসকল বাড়াবাঢ়ি। তারা আমাকেও আলাপে টানছিল। কিন্তু যোগ দিতে পারলাম না তার কারণ আমার সঙ্গে এ ধরনের কোনো আচরণই করা হয়নি।

আমেরিকায় যাওয়া আসা মিলিয়ে এ দীর্ঘ পথে আমি কেবল দুবাই বিমানবন্দরে দুজন মহিলাকে শাড়ি পরিহিত দেখেছি, বাকি সবাই হয় শেলোয়ার কামিজ অথবা শার্ট প্যান্ট পরা। আমেরিকায় যাবার পথে ঢাকা বিমানবন্দরে আমাদের দেশের একজন নারী দার্মী টেলিভিশন অভিনেত্রীকে দেখেছিলাম শার্ট প্যান্ট পরেই জারি করছিল। এ পর্যন্ত শাড়ি পরিহিত আমাকে দেখে প্রায় সকলেই প্রথমে একটি প্রশ্ন করেছে আমি ইভিয়ান কিনা।

দশ.

আমি অস্টিনে থাকতেই শুনেছিলাম পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাংলাদেশী পুরুষ যারা আমেরিকায় অবস্থান করছে তাদের সকলকেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এখন জানি না, বাংলাদেশী যাত্রীদেরও এরপর থেকে এভাবে নাজেহাল হতে হবে কিনা। ফ্লাইটের সময় হল, যথাসময়ে যাত্রাও শুরু হল। এবার দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে। আমার সীট খুঁজে দেখি পাশাপাশি দুটো সীটের একটি আমার এবং জানালার পাশের সীটে আগে থেকে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়সের একটি সাদা আমেরিকান যেয়ে বসে আছে। যাক বাঁচা গেল, মেয়েটির সঙ্গে গল্প করে কিছু সময় কাটানো যাবে। আমাকে দেখে মেয়েটি এমন সুন্দর একটি হাসি দিল যে আমি আশ্চর্ষ হলাম। মেয়েটির নাম আমি লিখে রাখিনি, এখন আর মনে করতে পারছি না, সেজন্য খারাপ লাগছে। মেয়েটি হিউটনের বাসিন্দা, কর্মসূল বাহরায়েন। আমিও হিউটন থেকে প্লেনে উঠেছি তাই আলাপ জমাতে সময় লাগল না। ওর মা হিউটনেই থাকে, বাবা আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করে অন্যখানে চলে গেছে। দুই ভাইবোনের মধ্যে সে বড়ো, ছেটো ভাই বিবাহিত। সে চাকুরির প্রয়োজনে অন্য স্টেটে থাকে। মেয়েটি নিজে এখনো বিয়ে করেনি। গত তিন মাস আট দিনে আমেরিকানদের

সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি মনে হল তার চেয়ে অনেক বেশি জানতে পারলাম এই সময়টাকু ওর সঙ্গে আলাপ করে। কথায় কথায় মেয়েটি জানাল হিউটন থেকে আমেরিকান পর্যন্ত সে শার্ট প্যান্ট পরেই এসেছে। দুবাই যাবার সময় সে লংকার্ট ফুল হাতা শার্ট আর একটি স্কার্ফ চাদরের মত করে গাযে দিয়েছে। আমি অবাক হয়েছি দেখে সে হেসে বলল যেখানে যেমন পরিবেশ সেখানে সেভাবেই চলতে হবে। আমার মনে প্রশ্ন ছিল অনেক। তাকে বললাম, কিন্তু তোমাদের দেশে তো কে কি পোশাক পরল সেটা কেউ খেয়াল করে না। সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দিল, কে বলেছে খেয়াল করে না, অবশ্যই খেয়াল করে তবে মুখে কিছু বলে না। জানো আমি যখন চার্টে যাই তখন যদি খারাপ পোশাক পরা কোনো মেয়েকে দেখি মনে হয় সে মেয়ের গার্জিয়ানকেই প্রশ্ন করি, কেন মেয়েকে এমন পোশাক পরতে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এই বয়সেই সে অনেক কিছু চিন্তা করেছে। সে মন খুলে কথা বলে যাচ্ছে আর আমি মন দিয়ে শুনছি। সে আরো বলল, মুশ্কিল হয়েছে কি জানো, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আঠারো বছর বয়সে এত স্বাধীন হয়ে যায় যে ওদের আর কিছু বলা যায় না। তার কথায় আমি একটু হেসে বললাম, তোমরা যে বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা দিচ্ছ আসলে সেটাই ভুল করার সময়। এই সময়টাতেই দরকার ভালো গাইডেস এবং যথার্থ শাসনের। আমাকে সমর্থন করে সঙ্গে সঙ্গেই সে বলল, তোমার অবজারভেশন কারেন্ট। কথাবার্তা গালগল যত এগোছে ততই বুঝতে পারছি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ওর একটি ভালো ধারণা আছে। এক পর্যায়ে জানতে চাইল আমার ছেলে মেয়েদের কিভাবে বিয়ে দিয়েছি। যখন বললাম আমার বড়ো ছেলে নিজেই মেয়ে পেসন্দ করেছিল তবে আমরা অভিভাবকেরা বিয়ে দিয়েছি। বড়ো মেয়ের ক্ষেত্রে আমরা পাত্র ঠিক করেছি বটে তবে মেয়ে সম্মতি দেবার পর তার বিয়ে হয়েছে। সম্মতি মেয়ের নিজস্ব বিবেচনা বা পছন্দ অপসন্দ থেকে, কোনো চাপ দেবার প্রয়োজন নেই। সে খুব আগ্রহভরে কথাগুলো শুনল। তারপর যে মন্তব্য করল তা আমার কাছে অন্তু লাগল। বলল সে, তোমাদের সোসাইটিতে সবাই কালেক্টিভ ডিসিশন নাও। সেকারণে যদি সিদ্ধান্তে কোনো ভুল হয় তাহলে ক্ষতিও একাই হয়, ফলে কষ্টও একাই বহন করতে হয়। আমার বেশ ভালো লাগল, কত গভীরভাবে উপলব্ধি করে কথাগুলো সে বলেছে। আমি বেশ মন দিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এর মধ্যে কয়েকবার খাবার এবং ড্রিফ্কস দিয়ে গেছে। এক প্যাকেট স্টেড বয়সটিতেই একা একা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর যদি সিদ্ধান্তে ভুল হয় তাহলে ক্ষতিও একাই হয়, ফলে কষ্টও একাই বহন করতে হয়। আমার বেশ ভালো লাগল, কত গভীরভাবে উপলব্ধি করে কথাগুলো সে বলেছে। আমি বেশ মন দিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এর মধ্যে কয়েকবার খাবার এবং ড্রিফ্কস দিয়ে গেছে। এক প্যাকেট স্টেড বাদাম ছিল তবু আমি ওর আস্তরিকতা প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। বাদামের প্যাকেটটি আমার ব্যাগে ভরে আমার ছেটো মেয়ে শাওনের জন্য নিয়ে এসেছিলাম।

ওর সঙ্গে আমি এর মধ্যেই বেশ আস্তরিক হয়ে উঠেছি। দুজনেই বয়সের ব্যবধান ভুলে কাছে চলে এসেছিলাম। আমি ছেলেমেয়েদের আমেরিকায় রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছি আর মেয়েটি ওর মাকে দেশে রেখে চাকুরির প্রয়োজনে দূরদেশে পাড়ি জমিয়েছে। উপরন্তু সে কিছুটা ভাঙ্গা পরিবারের সন্তান, দেশে তার মা একা, সেও বিদেশে একা। তবু কোথায় যেন একটি মিল খুঁজে পেলাম। কথাটা একটু খুলে বলতেই বাচ্চা মেয়ের মত সে উচ্ছলিত

হেসে উঠল। বলল, সেজন্যই তোমার আমার মধ্যে এত গল্প জমে উঠেছে। আসার সময় ওর মা কেমন করে কান্নাকাটি করেছে সেটা সুন্দরভাবে প্রায় অভিনয় করে দেখাল। বলল আমাকে, জানো, আমার মার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না যে আমি এত দূরে চাকরি করতে আসি, তার ওপর নিকটেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মা খুব টেনশন করছে। ওকে একটু সান্ত্বনার সুরে আমার মনের অবস্থার কথা জানালাম। উল্টো আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল, আসলে ছেলেমেয়েরা বড়ো হলেও মা বুবুতে চায় না সেটা, টেনশন করবেই। এ কথায় দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম। আমরা দুজনেই সীটের ওপর পা তুলে আরামে বসে গল্প করছিলাম। এক ফাঁকে আবার একটু ঘুমিয়ে নিলাম। এয়ার হোস্টেস গরম পিজা নিয়ে হাসি যুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পিজাটা তুলে নিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি কখন ঘুমিয়ে গেছে। এয়ার হোস্টেস ইশারায় মেয়েটিকে ডাকতে মানা করল। কোনো যাত্রী ঘুমিয়ে থাকলে তাকে ডাকা যাবে না, এটা মেনে চলা হয়। তাই ওকে ডাকতে পারছিলাম না আবার একা একাও খেতে ইচ্ছা করছিল না। তাড়াতাড়ি কাঁধ বাঁকা করে এয়ার হোস্টেসকে দেখালাম, ওর ঘুম ভেঙে গেছে। মোট হয় ঘন্টার যাত্রাপথে চার ঘন্টা পার হল। আর মাত্র দুই ঘন্টা বাকি দুবাই পৌছাতে। সত্যিই গল্পে সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে জিজাসা করলাম, তোমার ভাই বিয়ে করেছে, আশা করছি এবার তুমি বিয়ে করবে, তাই না? সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, ওহ নো নো। আমি এত রাশ করতে চাই না। আমাদের দেশে এত ডিভোস হয় সেকারণে তাড়াহড়া করে আমি কোনো ভুল করতে চাই না। আমি আরো সময় নিতে চাই। আন্তে ধীরে চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চাই। ভুল করে কষ্ট পাবার চেয়ে কোনো ভুলের পথে না যাওয়াই ভালো। আমার মনে হল ওর মার জীবনের ঘটনা ওর মধ্যে খুব প্রভাব ফেলেছে। চাকুরির প্রয়োজনে প্রাচ্যের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটেছে তাই নিজের দেশের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে ভালোমন্দের পার্থক্য প্রকটভাবেই ধরা পড়েছে ওর কাছে। সে চাইছে সমাজ ব্যবস্থার ক্রিটিগুলো দ্বাৰ করতে কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। দুজনে এক সঙ্গেই দুবাই বিমানবন্দরে এসে নামলাম। আমার পরের ফ্লাইট চার ঘন্টা পর আর ওর ফ্লাইট পরের দিন সকালে। আমাকে একেবারে ট্রাইসফার ডেক্স পর্যন্ত পৌছে দিয়ে সে নিজের গন্তব্যে চলে গেল। মনের কোণে ওর জন্য একটু কষ্ট অনুভব করলাম।

আমেরিকা ছেড়ে এসেই আগেই। ইউরোপও ছেড়ে এলাম। মেয়েটি চলে গেল। আমার মন জুড়ে এল পারিসা। পারিসা এখন কি করছে? সে কি দাদু দাদু বলে ডাক দিয়ে সারা বাসা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? সামনে শোভন শাওনের মুখ ভাসছে, পেছনে কনক কাস্তা, ওদের রেখে এলাম। আমি এখন ঘরেও নই ঘাটেও নই পথ চলার মধ্যখানে। কোথায় এ চলার শেষ? আবার উড়াল দেব, আবার চলতে থাকব আকাশের কিনার দিয়ে।

আমার ঘড়িতে অষ্টিনের সময় রয়ে গেছে, নাহিদ সময় বদলে নিতে নিষেধ করেছিল। এটা বেশ কাজে এল বলে মনে হচ্ছে। দুবাইতে এখন কয়টা বাজে জানি না। আমার ঘড়ির সময় অনুযায়ী অষ্টিনে এখন দুপুর বারোটা। তার মানে বাংলাদেশে রাত বারোটা। দুবাইয়ের সময় বাংলাদেশের চেয়ে দুই ঘন্টা পিছিয়ে। সুতরাং দুবাইতে এখন রাত দশটা

বাজে। বিমানবন্দরের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি আমার ঘড়ির সময় ঠিকই আছে।

ইরাকে যুদ্ধ চলছে এখান থেকে বিরাট কোনো দূরত্বে নয়। আমেরিকা থেকে বেরোনোর আগে আমার মনে কিছু ভয় ভীতি তো ছিলই। এখানে এসে সেভাবে যুদ্ধের কোনো আলামত দেখলাম না। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে, আমাদের প্রজন্ম যুদ্ধ কাকে বলে ভালো করেই জানে। কোয়ালিশন বাহিনীর হাতে ইরাক অধিকৃত এলাকায় পরিণত হতে যাচ্ছে। ইরাকী জনগণের কি ভবিষ্যত, কে জানে।

বিমানবন্দরের সকল আনন্দানিকতা সেরে নয় নম্বর গেইটের সামনে সোফায় বসে অপেক্ষা করছি। আমেরিকায় যাবার সময় এ পথ দিয়েই গেছি, সে সময়কার কিছু হয়রানির শৃঙ্খল মনের মধ্যে ছিল, সেগুলো ভাবছিলাম। বাংলাদেশ এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দুবাই বিমানবন্দরে বসেই তার কিছুটা অনুভব করা যায়। সোফায় বসে ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছি। কাতার আবুধাবি কুরেতে বাহরায়েন ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে একে একে যাত্রীরা আসতে থাকল। বলতে গেলে প্রায় নবই ভাগ যাত্রী বাংলাদেশের নাগরিক, আশে পাশের কোনো দেশে নানান ধরনের চাকুরি করে। তারা কেউ ছুটিতে দেশে যাচ্ছে, আবার কারো চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাই দেশে ফিরছে। এখন সহযাত্রীরা বেশির ভাগই স্বদেশী তাই পরিচিত পরিচিত পরিবেশ। ঢাকায় এসে পৌঁছালাম। আমার ঘড়িতে এখন বাংলাদেশী সময় মিলে গেল। অষ্টিন থেকে আমার যাত্রা শুরু তিরিশে মার্চ, ঢাকা এসে পৌঁছালাম এক এগিল। আসতে সময় লেগেছে চৰিশ ঘন্টা। মাঝখানে একত্রিশ মার্চ নেই। আমি এ বছরের একত্রিশ মার্চ পেলাম না। কেন পেলাম না তা বাচ্চাদের কাছে কুইজ আকারে জিজাসা করা যায়। পারিসা যখন বড়ো হবে তখন পারিসার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব। পারিসা কি উত্তর দেবে তা নিয়ে এখন কিছু অনুযান করছি না।

ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে প্রথমেই রিয়াদকে পেলাম। ওর কিছু কথা আগেই বলেছি। খুবই স্বত্ত্ব বোধ করলাম রিয়াদকে পেয়ে। আমেরিকায় যাবার সময়ও রিয়াদ আনন্দানিকতাগুলো সেরে নিতে খুব সাহায্য করেছিল। ওর কাবণেও সে সময় অনেক সাহস ও স্বত্ত্ব পেয়েছিলাম। এখন ফেরার সময়ে ওকে পেয়ে স্বত্ত্ব বোধ করলাম, নিজের মানুষদের মধ্যে ফিরে এলাম। বিমানবন্দরের আনন্দানিকতাগুলো রিয়াদই সেরে দিয়ে বাসায় টেলিফোন করে আমার আসার খবর জানিয়ে দিল। আমাকে বিমানবন্দরে রিসিভ করতে শোভন এসেছে এবং কনকের শাশুড়ি গাড়ি নিয়ে এসেছে। অনেক দিন পরে শোভনের হাসি মুখ দেখে মন ভরে গেল, রাত্তার ক্লান্তি ভুলে গেলাম। এই মুহূর্তে বাসায় ফিরে শাশুড়িকে নাকি পাব না, শোভন বলল সে বুয়েটে ক্লাসে যাবে। রিয়াদ আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরে তার ডিউটিতে ফিরে গেল। গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে শোভন, পেছনের সীটে কনকের শাশুড়ি এবং আমি বসলাম। অষ্টিনে থাকতে আমার পাশে বসত পারিসা, এই মুহূর্তে আবার অনুভব করলাম আমার পাশে পারিসা নেই। আমেরিকায় খালি রাত্তায় চলাক্রে করতে অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছিলাম, এখানে লোকজনের ভিড় বেশি মনে হল। আগে অভ্যন্ত ছিলাম, সুতরাং ভিড় বলে মনে হত না। দুদিন পর অভ্যন্ত হয়ে যাব, তখন আবার মনে হবে না।

কলোরাডো নদীর তীরে

বাসার গেইট দিয়ে চুকলাম, অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হল যে ঘরে ফিরলাম। বাসায় গন্ধরাজ গাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গেছে, একেবারে সাদা ফুলের বন্যা। এখন পূর্ণ বসন্তকাল, ফুলের উৎসব। পাশেই বোগেনভিলা গাছ, একই রকম লাল ফুলে ভরে গেছে। শতানো গাছ, অনেকটা কোনো উৎসবের জন্য সাজানো গেইটের মত মনে হয়। এর আগে কখনো এত ফুল ফুটতে দেখিনি। পারিসার দাদা বলল, নাকি আমি আসব তাই এত ফুল। শোভন আর শাওন মিলে ঘরে ঢোকার দরজাটিও লাল সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। শাওন বাসায় নেই, বুয়েটে ঝাসে গেছে। আমার স্বামী, পারিসার দাদা আমাকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করছে। বাচ্চা কাজের মেয়ে তানিয়া কাজ করছিল, আমি আসব বলে আমার অপেক্ষায়ও হয়ত ছিল। আমাকে দেখে সে কী খুশি! সাদা ফুলে হেয়ে থাকা গন্ধরাজ গাছের সামনে লাল বোগেনভিলার সামনে শোভন ও শাওনের ফুল দিয়ে সাজানো ঘরের দরজার সামনে আমার একার এবং বাকিদের সঙ্গে আমার অনেকগুলো ছবি তুলল শোভন, আমার ঘরে ফেরা মনে রাখার জন্যই। তানিয়ার জন্য কিছু শিফট এনেছিলাম, এগুলো পেয়ে তার আনন্দের সীমা নেই। এখন অপেক্ষা করছি শাওনের জন্য, বুয়েট থেকে দুপুরের বাসে ফিরবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল এবং আমাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে আর যেতে দিচ্ছি না। অস্টিনে কনক আমার স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছিল আর পারিসা আমার চারপাশে অস্ত্র হয়ে ঘুরছিল এবং বলছিল, দাদু তুমি থাক, দাদু তুমি যাবে না। ঘরে ফিরে শাওন বলল তোমাকে আর যেতে দিচ্ছি না।

আমি এখন কোন দিকে যাব?



কাজল ভূইয়া, জন্ম ১৯৫০, কলেজ অফ
হোম ইকনমিস্ক ঢাকা থেকে এমএসসি এবং
মিরপুর ল' কলেজ থেকে এলএলবি
ডিগ্রীপ্রাপ্ত। একটি কিডারগার্টেন স্কুলের
প্রিসিপ্যাল ছিলেন।

বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে
যুক্ত। বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।
কলোরাডো নদীর তীরে তাঁর প্রথম
প্রকাশিত গ্রন্থ। আমেরিকার টেক্সাস এবং
ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের বিভিন্ন স্থানে তাঁর
ভ্রমণকথা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।